Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোসনেয়ারা খাতুন

রোলঃ 216020016

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোসনেয়ারা খাতুন

রোলঃ 216020016

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হোসনেয়ারা খাতুন, আইডিঃ 216020016 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

হোসনেয়ারা খাতুন

আইডিঃ 216020016

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, পরম করুনাময় অতি দয়াবান, বিচার দিনের মালিক। তিনি আল্লাহ এক, তিনি অভাব মুক্ত। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নাই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত, তিনি সর্বজ্ঞ। প্রশংসা মাত্রই জগত সমূহের রব মহান আল্লাহর জন্য যার প্রদত্ত তাওফীকে সালাতের গুরত্ব ও ফযীলত নামক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে লিখার সুযোগ পেয়েছি।

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগনের উপর।

নামায কি?

ঈমানের পরই পালনীয় ইবাদত সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান হলো নামায। এর শাব্দিক অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা, রহমত কামনা করা ইত্যাদি। নামাযের আরবি হল সালাত। পারিভাষিক ভাবে ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে একান্ত বিশ্বাসের সহিত বিশেষ প্রার্থনা বা ইবাদতই নামায।

ইসলামের মূল ভিত্তি ৫ (পাচঁ) টি।

ক. কলেমা

খ. নামায

গ. রোজা

ঘ. হজ্ব

ঙ. যাকাত

নামায হলো দ্বীনের খুঁটি। জান্নাতের চাবি। মুমিনের জন্য মেরাজ স্বারূপ। আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার কথোপকথনের এক বিশেষ মাধ্যম। কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই

ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ন রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতার প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ঈমান নমে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّۃً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيۡدًا ؕ وَ مَا جَعَلۡنَا الۡقِبۡلَۃَ الَّتِىۡ كُنۡتَ عَلَيۡهَاۤ اِلَّا لِنَعۡلَمَ مَنۡ يَّتَّبِعُ الرَّسُوۡلَ مِمَّنۡ يَّنۡقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيۡهِ ؕ وَ اِنۡ كَانَتۡ لَكَبِيۡرَۃً اِلَّا عَلَى الَّذِيۡنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيۡعَ اِيۡمَانَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ

আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। আর তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলার উপর ছিলে, তাকে এ উদ্দেশ্যে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তারা বাদে অন্যের নিকট এটা বড়ই কষ্টকর ছিল। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩)

নামাযের হুকুম:

নামায এমনই এক ইবাদত, যা কলেমা কবুলের পর পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তেই তাকে আদায় করতে হবে।

হযরত আবু মালেক আল আশজায়ী (রাহ) তাঁর পিতা (ত্বারিক্ব ইবনু আশয়াম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কোন ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহন করতেন তখন নবী ﷺ তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন।

কেই ঈমান আনার পর পর নামায পড়ার জন্য কুরআন মজীদের সূরাহ ক্বিরাআত জানা না থাকলে তার পরিবর্তে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ওয়া লা –ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ এ সব তাসবীহ দ্বারা নামায আদায় করতে হবে কুরআন মজীদের সূরাহ- ক্বিরাআত শেখা পর্যন্ত।

সূত্র: সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: কিতাবুস সালাত হাদীস নং- ৫৪৪

কুরআন ও হাদীসের বানী থেকে প্রতীয়মান হয়ে যে প্রত্যেক মুসলামানের উপর নামায এক অপরিহার্য ফরয একমাত্র নামাযই মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অমুসলিমরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে মুসলিমরা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বাস্তব রূপ হচ্ছে নামায কারণ নামাযই একমাত্র ইবাদত, যেখানে মনোদৈহিক ঐকান্তিক তার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। ঈমান আনার সাথে সাথে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহর বানী:

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ

আমিই আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোন ইলহ নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো। আর আমার স্বারণেই নামায কায়েম করো। (সূরাহ নং ২০, ত্ব-হা আ: নং -১৪।)

হযরত ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ইসলাম পাঁচটি ভিত্তি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসুল এ-কথার স্বাক্ষ্য দেয়া।

২। নামায কায়েম করা

৩। যাকাত আদায় করা

৪। হজ্জ্ব করা এবং

৫। রমযানের রোযা রাখা।

পরিবার পরিজন ও মহিলাদের প্রতি নামায পড়ার নির্দেশ: মহান আল্লাহর বানী:

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَ الۡعَاقِبَۃُ لِلتَّقۡوٰی

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিয্ক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (সূরাহ নং২০, ত্বা-হা আ: নং -১৩২)

তিনি আরও বলেছেন:

وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ

অর্থ: "আর তোমরা (নারীরা) সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]

হযরত আবদুল মালিক ইবনু রাবি আহ ইবনে সাবরাহ (রা:) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, আর যখন তাঁদের বয়স দশ বছর হবে, তখন নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার করো অর্থাৎ শাস্তি দাও। (আবূ দাউদ ৪৯৫, আহমাদ ১৬৬৫০, ৬৭১৭)

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নামায কায়েমে মহান আল্লাহর বানী:

اَلَّذِيۡنَ اِنۡ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الۡاُمُوۡرِ

আমরা যদি তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করি, তারা অবশ্যই রাষ্ট্রে নামায কায়েম করবে। (আল হাজ্জ আ নং-৪১)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁ খিলাফতের সময় কর্মকর্তাদের প্রতি লিখে পাঠালেন যে, তোমাদের যাবতীয় কাজের মধ্যে আমার নকিট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তা সংরক্ষনে দায়িত্ব পুরোপরি পালন করে সে তার দীনকে রক্ষা করে। আর যে লোক তা বিনষ্ট করে সে এ নামায ছাড়াও অন্যান্য সবকিছু অধিক নষ্ট করে। (সূত্র: মুয়াত্তা মালেক : কিতাবুস সালাত হা: নং ৬)

নামায ফরজ দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত:

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সল্লামের উপর ফরয হয়েছে কিন্তু নামায বা সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহ তা-আলা তার সাথে কথপোকথন করেন এবং তার প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মিরাজের রাতে মিরাজ সম্পর্কিত হাদিসে তিনি বলেছেন, আমার উপর প্রত্যেক দিনে-রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায করয করা হয়েছে। (সহীহ আল বুখারী: ৩৪৯)

এ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ মিরাজ থেকে ফিরে আসার সময় হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর পরামর্শে রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে বার বার আবেদন করলে শেষ পর্যন্ত তা পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়। এ পাঁচ ওয়াক্তের ব্যাপারে ও বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসের শেষ পর্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

“হে মুহাম্মদ ! যাও দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নির্ধারন করা হলো । প্রতি ওয়াক্ত নামাযে দশ ওয়াক্ত নামাজের সমান সওয়াব রয়েছে। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হলো পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করবে, সে তাতে শুধু আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন এবং ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব লাভ করবে তা নয় বরং এত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সওয়াব পাবে।” (সহিহ বুখারী: ৩৩৪২)

এখানে মক্কায় যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়, তখন মূক্বীম অর্থ্যৎ আবাসস্থলে অবস্থানকালে ও সফরে মাগরিব ব্যতীত বাকি চার ওয়াক্তের নামায দু রাকাত করে ছিলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন জুহর, আছর, ও এশার নামায দু'রাকাত করে বাড়িয়ে চার রাকাত করা হয়। ফজর ও মাগরিব এবং সফরের নামায অগের মতো রাখা হয়। যেমন হযরত আশশাবী (র:) থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা:) বলেছেন:

মক্কায় নামাজ দু'রাকাত করে ফরয করা হয়েছিলো, যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন প্রত্যেক দু'রাকাতের সাথে আর দু'রাকাত করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে মাগরিব

তিন রাকাত ব্যতীত। কেননা, মাগরিবের নামায হলো দিনের বেজোড় নামায। আর বৃদ্ধি করা হয়নি ফজরের দু'রাকাতের সাথে কারণ- ফজরের দু'রাকাত দীর্ঘ ক্বিরাআতে পড়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যেতেন তখন চার রাকাতের নামাযগুলো আগের মতো দু'রাকাত করে পড়তেন।

নামাজের ওয়াক্ত এবং রাকাত সংখ্যা:

মহান আল্লাহ বানী:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِکَ ذِکۡرٰی لِلذّٰکِرِیۡنَ

অর্থ: নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্ত সময়ে (অর্থাৎ ফজর, জুহর ও আছর, মাগরিব এ সময় সমূহে) নিশ্চয়ই ভালো কাজ সমূহ সকল খারাপ কাজকে দূরিভূত করে দেয়। বস্তুত এটা এক মহা স্মারক সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণকারী (সুরাহ নং **১১**, হুদ, আ: নং- **১১৪**)

নামায ফরয হলো পাঁচ ওয়াক্ত। হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ তা'আলা কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি রাসুল ﷺ বলেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। লোকটি বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ, এর আগে ও পরে আরও কিছু আছে কি? তিনি বললেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয করেছেন। লোকটি তখন কসম করো বললো এর ওপর সে কিছু বাড়াবে ও না এবং তা থেকে কিছু কমাবেও না, রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে। (সহীহুল বুখারী **১৩৯৭**, মুসলিম **১৪**, আহমাদ **৮৩১০**)

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের রাকাত সংখ্যা হযরত উম্মুল মু-মিনীন আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মুকীম (অর্থাৎ আবাসস্থলে) এবং সফরে দুই রাকাত করে নামায ফরয করেছিলেন পরে সফরে নামায আগের মত রাখা হয় এবং মুক্কীম অবস্থার নামায বাড়িয়ে দেয়া হয়। যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনায় স্থায়ী হলেন, তখন আবাসস্থলে নামায দু'রাকাত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং ফজরের নামাযকে দু'রাকাতেই রাখা হয়েছে তাতে দীর্ঘ ক্বিরাআত পড়ার কারনে আর মাগরিবের নামাযকে তার অবস্থায় অর্থাৎ তিন রাকাতের ই রাখ হয়েছে, যেহেতু তা হলো দিনের (শেষে) বিজোড় নামায।

হাদীস অনুযায়ী, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের রাকাত সংখ্যা হলো ১৭।

ফরয নামাযের আগে পরে সুন্নত নামায পড়া:

হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনও রাতের মধ্যে মোট বারো রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করা হবে। (এ বারো রাকাত সুন্নাত নামাজ হলো) যোহরের ফরজ নামাযের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং ভোরে ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত। (তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০,৪৪৫)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত: নবী (সা:) ঘুমে থাকায় (একদা) ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়তে না পারলে তা তিনি সূর্য উদয়ের পর কাযা আদায় করেছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ২৭৮)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়তে পারেনি যে যেন তা সূর্য উদয়ের পরে হলেও পড়ে নেয়। (আহমাদ, তিরমিযী ৪২৩, হাকেম ১১৫৩, ইবনে খুযাইমা ১১১৭, সহীহুল জামে’ ৬৫৪২নং)

অন্য হাদিসে এসেছে,

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

হযরত ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি নবী (সা:) থেকে বর্ননা করেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়েন। (আবূ দাঊদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০)

সুন্নাত নামায ঘরে পড়া:

হাদিসে এসেছে,

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً». رواه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় (ফরয) নামায মসজিদে আদায় ক’রে নেবে, সে যেন তার কিছু নামায নিজ বাড়ির জন্যও নির্ধারিত করে । কেননা, তার নিজ ঘরে আদায়কৃত (সুন্নত) নামাযে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও বরকত প্রদান করেন ।” (মুসলিম ৭৭৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৬, আহমাদ ১৩৯৮২, ১৩৯৮৬)

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের শুরু এবং শেষ সময়:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বাইতুল্লাহর নিকট জিবরীল (‘আলাইহিস সালাম) দু’বার আমার সলাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যুহর সলাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ‘আসরের সলাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে ‘ইশা সলাত আদায় করলেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফাজ্‌র সলাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরীল (‘আলাইহিস সালাম) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নাবীগণের সলাতের ওয়াক্ত এবং সলাতের ওয়াক্তসমূহ এ দু’সময়ের মাঝখানেই নিহিত। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৯৩)

উল্লেখ্য দীনী আমালের শ্রেষ্ট আমলসমূহের মধ্যে একটি আমল হলো ‘ফরয’ নামায সমূহ তার আউয়াল ওয়াক্তের মধ্যে পড়া। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নামাযের জন্য প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। সালাতের প্রথম ওয়াক্তই আউয়াল ওয়াক্ত। হাদিসে এসেছে,

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, লটারির মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব হত না। অবশ্যই তারা লটারির মাধ্যমে ফায়সালা করত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ‘ইশা ও ফজরের সালাত (জামা’আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত। (সহিহ বুখারী: ৬১৫)

নামায শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্তাবলী:

নামাযের পূর্বে তার ওয়াক্ত হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

অর্থ: অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

নামায আদায় হওয়ার জন্য প্রথমত নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে কোন কোন সময় নামায পড়া জায়েয নয়।

নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময়ে কোন নামায না পড়া:

হাদিসে এসেছে,

عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

উক্কবা বিন আমের জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন;

(১) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত,

(২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং

(৩) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত।

(মুসলিম ১৯৬৬, আহমাদ ১৭৩৭৭, আবূ দাঊদ ৩১৯৪, তিরমিযী ১০৩০, নাসাঈ ৫৬০, ইবনে মাজাহ ১৫১৯, মিশকাত ১০৪০নং)

নামাযের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর বিষয়ে অবগত হওয়া ও যথাযথভাবে আদায় করা:

নামাযে মোট ১৩টি ফরজ ও ১৪ টি ওয়াজিব বিদ্যমান। এছাড়া আছে বহুবিধ সুন্নাহ। এসকল দিকে লক্ষ্য রেখে রসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় সালাত আদায় করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

নামাযের ফরজসমূহ:

নামাযে মোট ১৩ টি ফরজের মধ্যে নামায শুরুর আগেই ফরয ৭টি। আর নামাযের ভেতরে ৬ ফরয। নামাযে পূর্বশর্ত বা নামাযের বাইরের ৭ টি ফরয যথাক্রমে:

১. দেহ /শরীর পাক

২. পরনের কাপড় পাক

৩. নামায পড়ার স্থান পাক

৪. সতর ঢাকা

৫. কেবলামুখী হওয়া

৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া

৭. নিয়্যত করা

নামাযের ভিতরের ফরজ:

১. তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহ আকবার) বলা

২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া

৩. কিরাআত পড়া

৪. রুকু করা

৫. সিজদা করা

৬. শেষ বৈঠকে বসা

নামাযের ওয়াজিবসমূহ:

নামাজের ওয়াজিব -১৪টি

১. প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া

২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য যে কোন সূরা কমপক্ষে তিন আয়াত মিলানো

৩. ধীরস্থিরভাবে রুকু সিজদা করা

৪. রুকু থেকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ানো

৫. দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা

৬. প্রথম বৈঠকে দু'রাকাত পুরন করে বসা

৭. উভয় বৈঠকে আতাহিয়্যাতু (তাশাহুদ) পড়া

৮. ইমামের জন্য কিরাআত জোরের জায়গায় জোরে পড়া (ফজর,মাগরিব, এশা, জুম্মার ফরজ নামায ও দুই ঈদের নামায) এবং আস্তের জায়গায় (যোহর, আসর) আস্তে পড়া।

৯. বিতরের নামযে দু'আয়ে কুনুত পড়া

১০. ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা

১১. ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাআতের জন্য নির্ধারন করা

১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরজগুলোর ধরাবাহিকতা ঠিক রাখা

১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবেগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা

১৪. সালাম বলে নামায শেষ করা

নামাযের সুন্নাহসমূহ:

নামাযে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ১২টি

১. দুই হাত উঠান

২. দুই হাত বাঁধা

৩. ছানা পড়া

৪. আউজুবিল্লাহ পড়া

৫. বিসমিল্লাহ পড়া

৬. প্রত্যেক উঠা বসায় ‘আল্লাহু আকবার’ বলা

৭. আলহামদুর (সূরা ফাতিহার) পর ‘আমীন বলা

৮. রুকুর তাসবীহ পড়া

৯. রুকু হতে উঠার সময় তাহমীদ ও তাসবিহ বলা

১০. সিজদার তাসবীহ বলা

১১. দুরূদ শরীফ পড়া

১২. দু’আয়ে মাছুরা পড়া

জামা’আতে নামায আদায়:

‘‘জামা‘আত’’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের আধিক্য। তেমনিভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও একত্রিত হওয়াকেও ‘‘জামা‘আত’’ বলে আখ্যায়িত

করা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় "জামা'আত" বলতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে দু' (ইমাম ও মুক্তাদি) বা ততোধিক ব্যক্তির মসজিদ অথবা সেরূপ কোনো জায়গায় একই সময়ে একত্রিত হওয়াকে বুঝানো হয়। সালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার মাহাত্ম্য কুরআন ও হাদীসে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রতি বেলা সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার ব্যাপারেও পূর্ণ যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে আসরের সালাতের প্রতি এবং তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য দণ্ডায়মান হও"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সালাতের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করে না সে সালাতের প্রতি কতটুকু যত্নবান তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

দৈনিক পাঁচ বেলা সালাত জামা'আতে পড়া প্রতিটি সক্ষম ও সাবালক পুরুষের ওপরই ওয়াজিব। চাই সে সফরে থাকুক অথবা নিজ এলাকায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। অর্থাৎ সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায় করো"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩]

উক্ত আয়াত জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কারণ, আয়াতের শেষাংশ থেকে সালাত প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা আয়াতের

প্রথমাংশের সাথে প্রকাশ্য সামঞ্জস্যহীনই মনে হয়। কেননা, আয়াতের প্রথমাংশে সালাত প্রতিষ্ঠার আদেশ রয়েছে। তাই আয়াতের শেষাংশে তা পুনরুল্লেখের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাই বলতে হবে, আয়াতের শেষাংশে জামা'আতে সালাত আদায়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:
وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ

“যখন আপনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে যান তখন তাদের এক দল যেন অস্ত্রসহ আপনার সাথে সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা সাজদাহ সম্পন্ন করে যেন আপনার পেছনে চলে আসে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় দলটি যারা পূর্বে সালাত পড়ে নি আপনার সাথে যেন সালাত পড়ে নেয়। তবে তারা যেন সতর্কতা ও অস্ত্রধারণাবস্থায় থাকে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০২]

উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামা'আতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোনো ছাড় থাকতো তথা তা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব হতো তা হলে যুদ্ধাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে জামা'আতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শেখানোর কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হতো না। বরং তারা উক্ত ছাড় পাওয়ার বেশি উপযুক্ত ছিলো। যখন তা হয় নি তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামা'আতে সালাত আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া পুরুষের জন্য ঘরে ফরজ সালাত পড়া জায়িয নয়।

তেমনিভাবে উক্ত আয়াতে উভয় দলকেই জামা'আতে সালাত আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে। যদি কেউ কেউ জামা'আতে সালাত পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তাহলে উভয় দলকেই এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে জামা'আতে সালাত আদায়

করতে আদেশ করা হতো না। তাই জামা'আতে সালাত পড়া প্রতিটি ব্যক্তির ওপরই ওয়াজিব। চাই সে সফরে থাকুক অথবা নিজ এলাকায়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ٤٢ خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ وَقَدۡ كَانُواْ يُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ

"স্মরণ করো সে দিনের কথা যে দিন জঙ্ঘা (হাঁটুর নিম্নাংশ) উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদাহ করার জন্য তখন তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি থাকবে তখন অবনত এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিলো তখন তাদেরকে সাজদাহ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিলো। (কিন্তু তারা তখন সে আহ্বানে সাড়া দেয় নি)"। [সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ৪২-৪৩]

আল্লামা ইবরাহীম তাইমী রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: তাদেরকে আযান ও ইক্বামতের মাধ্যমে ফরয সালাতগুলো জামা'আতে আদায়ের জন্য ডাকা হতো।

বিশিষ্ট তাবঈ আল্লামা সা'য়ীদ ইবন মুসাইয়িব রহ. বলেন: তারা "হাইয়া 'আলাস-সালাহ, হাইয়া 'আলাল-ফালাহ" শুনতো অথচ তারা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করতো না।

কা'ব আল-আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর কসম! উক্ত আয়াতটি জামা'আতে সালাত না পড়া লোকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানে মুআয্যিনের আযানে সাড়া দিয়ে মসজিদে এসে জামা'আতে সালাত পড়া। যা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يُلاَئِمُنِيْ إِلَى الْـمَسْجِدِ فَهَلْ لِيْ رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

"জনৈক অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন: আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো লোক নেই। তাই আমাকে ঘরে সালাত আদায় করতে অনুমতি দিবেন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো: জি হাঁ! তিনি বললেন: তাহলে তোমাকে মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে হবে"। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৩)

উক্ত হাদীসে মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দেওয়া মানে যদি শুধু সালাত পড়াই হতো চাই তা যেখানেই পড়া হোক না কেন তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীকে তার ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাওয়ার পর আর তাকে আযান শুনার প্রশ্ন ও মুআয্যিনের ডাকে সাড়া দেওয়ার আদেশই করতেন না। কারণ, সে তো ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতিই চাচ্ছিলো।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে আরো অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্যই প্রদান করে।

আব্দুল্লাহ ইবন উম্মু মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো অন্ধ এবং আমার ঘরও মসজিদ থেকে অনেকখানি দূরে অবস্থিত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মদীনা তো একটি সাপ-বিচ্চু ও হিংস্র প্রাণীর এলাকা। আবার অনেক সময় আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো লোকও পাওয়া যায় না। তাই কি আমি এমন পরিস্থিতিতে ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি পেতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি আযান শুনতে পাও? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কি "হাইয়া 'আলাস-সালাহ, হাইয়া 'আলাল-ফালাহ" শুনতে পাও? তিনি বললেন: জি হাঁ!

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

“আমি তোমার জন্য ঘরে সালাত আদায়ের কোনো অনুমতিই খুঁজে পাচ্ছি না”। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৫২)

যখন এক জন অন্ধ ব্যক্তি ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি পাচ্ছে না তাহলে এক জন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কীভাবে ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি পেতে পারে?! এতেই বুঝা গেলো, জামা‘আতে সালাত আদায় করা প্রতিটি ব্যক্তির ওপর নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে সালাত পড়া কোনোভাবেই সঠিক নয়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিন্তু জামা‘আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে কম তাগিদ দেন নি; বরং তিনি যারা জামা‘আতে উপস্থিত হচ্ছে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَرَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

“আমার ইচ্ছে হয় কাউকে সালাত পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামা‘আতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা‘আতে সালাত ত্যাগকারীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো এতো বড়ো জঘন্য কাজ করার ইচ্ছা কখনোই পোষণ করতেন না যদি না জামা‘আতে সালাত পড়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হতো। আর যদি কেউ কেউ জামা‘আতে সালাত পড়লে অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবীগণ জামা'আতে সালাত আদায় করলেই অন্যদের পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব আদায় হয়ে যেতো।

সালাফে সালেহীন বা সৎ পূর্বসূরীদের জামা আতের সালাত আদায় ও' তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হওয়ার প্রতি সচেষ্ট থাকার বাস্তব নমূনা:

১। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার সালাতের জামা'আত ছুটে নি।"

২। আবু হাইয়্যান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী'ঈ ইবন খুসাইমকে পক্ষাঘাত (রোগ) অবস্থায় সালাতের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি তো "হাইয়্যা 'আলাস সালাহ" শুনতে পাই, তোমাদের যদি সালাতে পৌঁছার সমর্থ থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হও।"

৩। ইবরাহীম আত-তাইমী রহ. বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তিকে সালাতের তাকবীরে উলায় (প্রথম) অংশ গ্রহণে অলসতা করতে দেখ তবে তার থেকে বিমূখ হয়ে যাও।"

৪। মুস'আব বলেন, 'আমের মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলেন, আমার হাত ধর, (মসজিদে যাওয়ার জন্য) তাকে বলা হলো: আপনি তো অসুস্থ। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিব না? লোকেরা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিব সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকাত সালাত আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম)

৫। ওয়াকী‘ ইবন জাররাহ বলেন, “আ‘মাশের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল তবুও তার (সালাতে) তাকবীরে উলা ছুটে নি।”

৬। মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বলেন, “সা‘ঈদ ইবন আব্দুল আযীযের সালাতের জামা‘আত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।”

৭। গাস্সান বলেন, আমার নিকট আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা বিশর ইবন মানসুর বাসরীকে তাকবীরে উলা ছুটেছে দেখি নি।”

প্রাণবন্ত নামায:

নামাযের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে গোপনে কথোপকথন হয় তা সুস্পষ্ট। বান্দার প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জওয়াবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা একমাত্র তারই অনুভব করতে পারে যারা সুরাহ ফাতিহার অর্থসহ তার আযতগুলো থেকে থেমে ধীরে ধীরে তৃপ্তিসহকারে পড়ে ।

ক) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যে ভাবে নামায আদায় করতেন, সেভাবে আদায় করতে হবে।

খ) নামাযে তিনি যে অবস্থায় যা পড়েছেন তা শুদ্ধ করে পড়তে হবে। এবং তা ঠোঁট ও জিহ্বা নেড়ে উচ্চারণ করতে হবে। মনে মনে পড়লে চলবে না।

(গ) নামাযে দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) বিভিন্ন অবস্থায় হাত বিভিন্ন ভাবে রাখতে হবে।

(ঙ) বিভিন্ন অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে চেখে তাকতে হবে।

(চ) রুকু ও সিজদা যথাযথ নিয়মে করতে হবে।

এসবই রাসুল (সা:) শিক্ষা দিয়েছেন। নামাযে মনের ট্রেনিং আরও গুরত্বপূর্ণ। মনোযোগ অর্থাৎ খুশু অত্যন্ত দরকারী আমল। মনে রাখতে হবে দিনে রাতে ২৪ ঘন্টার রুটিন নামায দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। নামাযের দেহটিকে মুনিবের নিকট সুন্দর অবস্থায় পেশ করতে হবে। নামায আদায়ের সময় মনের অবস্থার উপর নামযের রূহ পয়দা হওয়া নির্ভর করে। নামাযে দেহ যখন সে অবস্থায় থাকে তখন মনে যে চেতনা থাকা উচিত তা থাকলেই নামায জীবন্ত হবে। খেয়াল রাখতে হবে, হে আল্লাহ, গৌরব, প্রশংসা, বরকত ও মর্যাদা তোমারই। আমি খাঁটিভাবে আমার সমগ্র মনোযোগ তোমার প্রতিই দিলাম। বুকের বাম দিকে থাকা মানুষের কলব বা দিল্। সালাতে সবটুকু মনোযোগ কালবের দিকে থাকবে। মনের খুঁটিটাকে কালবের উপর মযবুত করে গেড়ে দিতে হবে। শয়তান কালব থেকে মানোযোগ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই থাকবে। নামাযিকেও বারবার মনোযোগ কালবে কেন্দ্রীভুত করতে হবে। কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে গোপনে কথা বলে। জীবন্ত নামাযের বাস্তব অবস্থা এটাই। নামায মুমিনের মি'রাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গিয়েছিলেন স্বশরীরে আর নামাযে মুমিনের মি'রাজ হয় শুধু রূহানীভাবে। নামাযে আল্লাহর সাথে নামাযীর সঙ্গোপনে সংলাপ চলে। এটা অন্তরে অনুভব করার বিষয়। নামায যতটা জীবন্ত হয়, এ অনুভুতি ততই গভীর হয়।

সালাতে সালাফে সালেহীনের বিনয় ও একাগ্রতার কতিপয় বাস্তব চিত্র

১। 'আমের আবদে কায়েস আম্বারীকে বলা হলো: "আপনি কি সালাতে স্বীয় আত্মার সাথে কথা বলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার আত্মা সাথে আল্লাহর সম্মুখীন এবং স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে কথা বলি।"

২। 'আলী ইবন হুসাইন ইবন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন তার কম্পন শুরু হয়ে যেত। যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: "তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই এবং কথোপকথন করি"?

একবার তার বাড়ীতে আগুন লেগে যায় আর তিনি তখন সাজদারত ছিলেন। সাজদাহ থেকে তিনি যখন মাথা উঠান সে সময় আগুন নিভে গিয়েছিল, এ ব্যাপারে তাকে বলা হলে তিনি বলেন, "আমাকে অন্য আরেকটি আগুনে এই আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।"

৩। মুসলিম ইবন ইয়াসার আল বাসারী যখন সালাত আদায় করতেন মনে হতো যেন একটি কাঠ দাঁড়ানো আছে। এদিক সেদিক ঝুকতেন না এবং যখন সালাত শুরু করতেন তার পরিবারকে বলতেন: "তোমরা কথপোকথন কর, কেননা আমি তোমাদের কথা শুনতে পাই না।"

৪। আ'মাশ বলেন, "ইবরাহীম আত-তাইমী যখন সাজদাহ করতেন মনে হতো তিনি যেন কোনো দেওয়ালের অংশ এবং চড়ুই পাখী তাঁর পিঠে বসে যেত।"

৫। আহমদ ইবনে সিনান বলেন, "আমি ওয়াকী'কে দেখেছি যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন সামান্যতমও নড়াচড়া করতেন না এবং উভয় পায়ে ভর না দিয়ে শুধু এক পায়ে ভর করে ঝুঁকে যেতেন না।"

৬। ইয়া'কুব ইবন ইয়াযীদ বাসরীর একবার সালাতের অবস্থায় কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং তাকে এরপর ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সালাতে মগ্ন থাকার জন্য তিনি তা অনুভবও করতে পারেন নি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন।

৭। মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবন নাসর মারওয়াযীর চেয়ে উত্তম সালাত আদায়কারী অন্য কাউকে দেখি নি, তার কানে মাছি বসতো এবং রক্ত বয়ে যেত, কিন্তু তিনি মাছিকে সরাতেন না, অতঃপর তিনি বলেন, তিনি স্বীয় চিবুক (থুৎনি) বুকে রেখে এমনভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন যে মনে হতো তিনি একটি স্থাপনকৃত কাঠ।"

(ইমাম যাহাবী রহ-এর "সিয়ারু আলামিন নুবালা" এর তাহযীব, মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন আকীলের "নুযহাতুল ফুযালা" থেকে সংকলিত)

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

নামাযের আদেশ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।- সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে

মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।-সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।–সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

أُتْلُ مَآ أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।-সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হ্যাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।-সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো আয়াত আছে, সূরা বাকারা ১১০, সূরা আনআম ৭২, সূরা নূর ৫৬, সূরা রূম ৩১, সূরা মুজাদালা ১৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার

বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ স¤প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি

জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیۡۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخۡلَعۡ نَعۡلَیۡكَ ۚ اِنَّكَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًی وَاَنَا اخۡتَرۡتُكَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِكۡرِیۡ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।-সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির[১] এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির...।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।-সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।-সূরা মায়েদা (৫) : ১২

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়িনা ৫

নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ.

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।-সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।-সূরা নামল (২৭) : ১-৩

এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।-সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই

উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।-সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)।

এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।-সূরা মাআরিজ (৭০) : ২৩-৩৫

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায

সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

মূমিনের জীবনে নামাযের প্রভাবঃ

নামাযের আদ্যোপান্ত নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নামায কত বড় প্রভাবক বিষয়। মুমিন যদি সচেতনভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, তাহলে অবশ্যই নামায তাকে ভেতরে-বাইরে উন্নত থেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে।

এক. নামায হচ্ছে পবিত্রতা

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। তাহলে নামায আদায়ের শুরু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ (ধৌত করবে)। আর যদি গোসল জরুরি এমন নাপাক অবস্থায় থাক, তাহলে সমধিক পবিত্রতা অর্জন করবে (গোসল করবে)। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সহবাস কর; অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করবে; তা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ কষ্ট

আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর দান পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা শোকর কর। সূরা মায়েদা (৫) : ৬

ওযু-গোসলের বিধান পবিত্রতার জন্য। তবে এর মাধ্যমে যে পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় তা তো খুবই স্পষ্ট। ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক, যা ওযুর সময় আরো তাকীদপূর্ণ। মিসওয়াকের তাৎপর্য উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা (পরিচ্ছন্নতা) ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫

আমরা জানি, মানুষের উন্নত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী জীবনধারায় তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইসলামে ফরজ-নফল সবধরনের নামাযে পবিত্রতা অপরিহার্য। আর আগে বলা হয়েছে, ওযু-গোসলের বিধানের অন্যতম সুফল ও তাৎপর্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। কাজেই নিয়মিত নামায আদায়কারী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখবে তখন এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্বভাবও তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্রতা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উন্নত বিষয়। ইসলামে পবিত্রতার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ন্যূনতম সুফলটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, যা সভ্য জীবনের অতি বড় অনুষঙ্গ।

পবিত্রতার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাপের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে পবিত্রতার এই সুফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

কোনো মুমিন বান্দা যখন ওযু করে, ওযুতে সে যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে পানির সাথে ঐসব গোনাহ ঝরে পড়ে, যার দিকে সে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। এরপর যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন দুই হাত থেকে পানির সাথে ঐসকল গোনাহ ঝরে পড়ে, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে ঐসকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যার মধ্যে সে পা দিয়ে চলেছিল। পরিশেষে সে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِه.

যে ওযু করে ও উত্তমরূপে ওযু করে, তার শরীর থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব না, যারা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করবেন?

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময়গুলোতে পূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। এই হচ্ছে 'সীমান্ত প্রহরা'। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১

সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه، إِلاَّ فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

তিরিমিযীর বর্ণনায় এই দুআয় কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে এই কথাটুকুও আছে,

اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আমাকে অধিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সুন্নাহ মোতাবেক ওযু করার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাই অর্জিত হয় না, গোনাহের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

দুই. নামায আল্লাহ তাআলার স্মরণ

আল্লাহর স্মরণ সকল পুণ্যের চাবিকাঠি, সকল পাপ থেকে বাঁচার উপায়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ যত গভীর হবে, ততই তা জীবন ও কর্মকে পরিশীলিত করবে।

নামায হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ.

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করবে এবং আমার স্মরণে নামায আদায় করবে। সূরা ত্বহা (২০) : ১৪

বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন করা। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আকীদা-বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং এক আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে মহিমান্বিত ইবাদত হচ্ছে নামায। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে নামায আদায় করবে। নামাযেও আল্লাহকে স্মরণ করবে।

এই আয়াতে বর্ণিত সম্বোধন হযরত মূসা আ.-কে লক্ষ করে হলেও কুরআন মাজীদে তা বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তে নামাযের যে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাতে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর স্মরণে

নামায আদায় করতে হবে। এর বাইরেও অন্যান্য সময় আল্লাহর স্মরণে নফল নামায আদায় করা, এমনকি কখনো নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে নামায কাযা হয়ে গেলে চেতন হওয়া মাত্র যখন নামাযের কথা মনে পড়ে তখন পবিত্র হয়ে নামায আদায় করাও এ আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

أُتْلُ مَآ أُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

আপনার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

এই আয়াতে নামাযের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নামায নামাযীকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আর কুরআন মানুষকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদা, নামাযের যিকির ও তাসবীহ নামাযীকে আল্লাহ তাআলার সাথে তার আব্দিয়াতের সম্পর্ক নবায়ন করে দেয়। কাজেই যে নামাযের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বাণী শ্রবণ করে, সে বুঝতে পারে যে, নামায তাকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ। এটি আরো বড় বৈশিষ্ট্য। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নামাযী মুখ, অন্তর ও গোটা দেহের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণে নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায, যা মন-মস্তিষ্ক, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আলী রা. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নামাযে পঠিত দুআর বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসে সিজদার দুআ সম্পর্কে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় বলতেন,

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَه وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَرَه، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য সিজদা করেছি, আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, আপনারই সামনে অনুগত-সমর্পিত হয়েছি। আমার মুখমণ্ডল তাঁকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, রূপ দান করেছেন, এর চোখ-কান কেটেছেন। প্রভূত বরকতময় আল্লাহ, সকল স্রষ্টার সর্বোত্তম স্রষ্টা। সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১

নামাযে রুকু-সিজদার তাসবীহ ও অন্যান্য রোকনের যিকির-তিলাওয়াতে আল্লাহ তাআলার স্মরণের অত্যন্ত গভীর উপাদান রয়েছে। নামাযী যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্বকে অন্তরে জাগ্রত করবে, ভেতর-বাইরে একাগ্র-একনিষ্ঠ থাকবে, নামায ততই পূর্ণাঙ্গ হবে এবং নামাযের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ততই অর্জিত হতে থাকবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর স্মরণই অভিষ্ট লক্ষ্য এবং এটি ঐ মহান উপাদান, যা মানুষকে দুনিয়া-আখেরাতে মহা কল্যাণের অধিকারী করে এবং চূড়ান্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। ইরশাদ হয়েছে,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব। সূরা বাকারা (০২) : ১৫২

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহে ভূষিত হওয়া, নূর, হেদায়েত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। আল্লাহ তাআলার এই মহা অনুগ্রহ যে বান্দার নিজের কর্ম থেকে অনেক অনেক বড় তা তো বলাই বাহুল্য। বান্দাও আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও বান্দাকে স্মরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বান্দার স্মরণের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় বান্দা গোনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذلِكَ؟ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه شَيْئًا، قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

বল তো, তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নহর থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে কী বল, তার দেহে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তার দেহে কোনো ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮

তিন. নামাযে রয়েছে পঠন, শ্রবণ ও উপলব্ধি

নামায ধ্যান-খেয়ালের সাথে আদায় করা কাম্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.

নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়াবনত। সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-২

উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه.

যে মুসলিমের সামনে ফরয নামায উপস্থিত হয়, অতঃপর সে ভালোভাবে ওযু করে, খুশূ অবলম্বন করে, উত্তমরূপে রুকু করে, এই নামায তার পূর্বের গোনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর এই পুরস্কার সবসময়ের জন্য। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্ষমা ও সাফল্য তাদের জন্য, যারা খুশূর সাথে নামায আদায় করে। খুশূ মূলত অন্তরের নম্রতা। আর এর বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা ও নম্রতার মধ্য দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বান্দা তখনই নামাযে খুশূওয়ালা তথা বিনয়াবনত হয় যখন তার উপলব্ধিতে থাকে যে, সে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়েছে। নামাযে যা বলা হয় এবং যা পড়া হয় তার দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে। আলেমগণ বলেছেন, খুশূর প্রথম ধাপ হচ্ছে, নামাযে পঠিত বিষয়াদির দিকে ধ্যান রাখা। যা বলা হচ্ছে তা অন্তর থেকে বলা, যা পড়া হচ্ছে অন্তর থেকে পড়া। এভাবে মনোযোগের সাথে যখন নামায পড়া হবে তখন তা মুমিনের সাফল্যের উপায় হবে। তার ঈমান বাড়তে থাকবে, ইলম বাড়তে থাকবে। অন্তরের অবস্থার উন্নতি হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থিরতা আসবে এবং চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহমুখিতা তৈরি হবে।

চার. নামায হচ্ছে দুআ

আরবী ভাষায় 'সালাত' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ দুআ। কুরআন মাজীদেও 'সালাত' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে ইরশাদ হয়েছে,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ.

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন; যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তির উপকরণ। সূরা তাওবা (৯) : ১০৩

নামাযকে ‘সালাত’ নামে নামকরণের অন্যতম কারণ নামাযের তিলাওয়াত ও যিকির-তাসবীহতে দুআর উপস্থিতি। ইমাম নববী রাহ. বলেন,

هذا قول جماهير أهل اللغة العربيّة والفقهاء وغيرهم.

এটি অধিকাংশ আরবী ভাষাবিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ ও অন্যদের বক্তব্য।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, নামাযের সিংহভাগ বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুআ। সূরাতুল ফাতিহা, যা প্রতি নামাযে অবশ্যপঠনীয়, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথের প্রার্থনা ও দুআ।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

আমি সালাতকে (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

বান্দা যখন বলে,

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ.

আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন সে বলে,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

(যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَجَّدَنِي عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।

যখন সে বলে,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

[(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।]

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

যখন সে বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

এছাড়া নামাযের ছানা, রুকু-সিজদার তাসবীহ ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে দুআ। কারণ মহান দাতার সামনে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা তাঁর কৃপা লাভেরই প্রার্থনা। একারণে কোনো কোনো হাদীসে আল্লাহর যিকিরকেও দুআ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দুআ এই ছিল,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আর নামাযের আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদের পর বিশেষভাবে দুআ পাঠের নিয়ম রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ‘আত্তাহিয়্যাতু’ শিক্ষা দান করেছেন। এরপর বলেছেন,

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.

এরপর নামাযী তার কাছে সবচেয়ে পছন্দের দুআটি নির্বাচন করে দুআ করবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৫

সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত হয়। সালামের বাক্যটিও মূলত দুআ। নামায সমাপ্ত হওয়ার পর হাদীস শরীফে বিভিন্ন দুআর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু দুআ উল্লেখ করছি।

সহীহ হাদীস থেকে নামাযের পরের কিছু দুআ

১. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন,

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

[ইয়া আল্লাহ! আপনিই ‘সালাম’ (শান্তিদাতা)। শান্তি আপনারই পক্ষ থেকে। হে প্রতাপ ও মর্যাদার মালিক! আপনি প্রভূত বরকতময়।] সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯১

নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত দুআ পড়ার বিষয়টি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯২]

২. মুগীরা ইবনে শু’বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা ইবনে শো‘বা রা. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-কে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক (ফরয) নামাযের সালাম ফেরানোর পর বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি যা দান করেছেন তা রোখার কেউ নেই। আর আপনি যা থেকে বঞ্চিত করেছেন তা দেওয়ার কেউ নেই। আর সম্পদশালীর সহায়-সম্পদ আপনার বিরুদ্ধে কোনোই কাজে আসবে না।) সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৪৪, ৬৩৩০, ৭২৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩

৩. আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রা. প্রতি নামাযের শেষে যখন সালাম ফেরাতেন বলতেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। শক্তি ও পরিবর্তন একমাত্র আল্লাহরই তাওফীকে।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি। দান তাঁর। মর্যাদা তাঁরই, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। উপাসনা-আনুগত্য একান্তই তাঁর জন্য। কাফিরদের তা অপছন্দের হলেও।)

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের শেষে এই বাক্যগুলো দ্বারা 'তাহলীল' করতেন। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৪

তাহলীল অর্থ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলা। উপরের দুআয় এই বাক্যটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর তেত্রিশ বার তাসবীহ' করবে, তেত্রিশ বার হাম্দ করবে এবং তেত্রিশ বার তাকবীর বলবে, ফলে নিরানব্বই হল, এরপর এই দুআ দ্বারা একশত পূর্ণ করবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

তার পাপরাশি সাগরের ফেনা সমপরিমাণ হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৭

৫. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। এরপর বললেন, তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুয়ায! কোনো নামাযের পর এই দুআ পড়তে ছেড়ো না,

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

ইয়া আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন; যেন আপনার যিকির করি, আপনার শোকর করি এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করি। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২২

এছাড়া আরো যিকির ও দুআ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নামাযের ভেতর-বাহির মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় পরিপূর্ণ।

পাঁচ. নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়

এই নামায মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ.

কখনো নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন এবং (সিজদা ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে) নিকটবর্তী হোন। সূরা আলাক (৯৬) : ১৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন আবু জাহল নানাভাবে তাঁর নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পরোয়া না করে নামায আদায়ে যত্নবান থাকার নির্দেশ দান করেছেন। তাঁর সকাশে সিজদা করতে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে বলেছেন। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযে সিজদা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় উপায়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত। সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২

এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভেতরে। এদিক থেকে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নয়। মুমিন-কাফের সবার সকল কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ অবগত। গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর কবজার ভেতরে। তবে এটা হচ্ছে সাধারণ নিকটবর্তিতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য শুধু সৎকর্মপরায়ন মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত ঈমানদার সৎকর্মপরায়নদের অতি নিকটে। সূরা আরাফ (০৭) : ৫৬

সেই নৈকট্যের অর্থ তাঁর সন্তুষ্টি, দান ও অনুগ্রহ। কাজেই সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি অর্জন করে, সবচেয়ে বেশি দান ও অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়।

উপরের পাঁচটি বিষয় নামাযের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, এই বিষয়গুলো রক্ষা করে নামায আদায় করা হলে নিঃসন্দেহে এই নামায বান্দার গোটা জীবন ও কর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবে। তার চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস ঈমানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হবে, স্বভাব-চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হবে, কাজ-কর্ম পরিশুদ্ধ ও গোনাহমুক্ত হবে। মহান আল্লাহ তাআলার দান ও অনুগ্রহে তার গোটা জীবন সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

ছয়ঃ নামায মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক:
আল্লাহ তা''আলা বলেন,

وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, “নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।” (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও,

আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সাত:সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয় "নম্র।-[সূরা আলমুমিন-, আয়াত[২-১ :

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন',

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

আট: সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

নয়: সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে:

সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হাহুতাশ ও- অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তাআলা বলেন‘,

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ﴿۱۹﴾

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ﴿۲۰﴾

وَّ اِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًا ﴿۲۱﴾

اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَ ﴿۲۲﴾

الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হাহুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে-, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত

আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত। ”(সূরা আল মাআরিজ, আয়াত:১৯-২৩)

দশ: সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো। _____(মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

(১) ফজরের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। মুমিন মাত্রই যত্নের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকেন। তবে মানবজাতির চিরশত্রু ইবলিস সর্বদাই চেষ্টা করে, যেন মুমিনগণ নামায থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। শয়তানের ধোঁকা ও গাফলতের কারণে অনেকেই নামাযে অবহেলা করেন বা নামায ছেড়ে দেন; যা মুমিনের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ। বিশেষ করে ফজর ও আসরের নামাযে বেশি গাফলতি হয়ে থাকে। মহান রাব্বুল আলামীন তাই কুরআনুল কারীমে এই দুই নামাযের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

حٰفِظُوْا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی.

তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী (তথা আসরের) নামাযের প্রতি যত্নবান হও। -সূরা বাকারা (০২) : ২৩৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন; সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০

এই আয়াতে গাফলতের দুই ওয়াক্ত ফজর ও আসরের নামাযের কথা উল্লেখ করে এর সবিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

এক. আল্লাহ কসম করেছেন ফজরের

প্রতি ওয়াক্ত নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফজরের গুরুত্ব অন্য সব ওয়াক্তের তুলনায় বেশি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফজরের কসম করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ.

কসম ফজর-কালের। এবং দশ রাতের। -সূরা ফাজর (৮৯) : ১-২

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরই কসম করেন। যেহেতু আল্লাহ ফজরের কসম করেছেন, তাই এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই সময় এবং এই সময়ে আদায়কৃত নামাযের গুরুত্ব অন্য সময় ও নামাযের তুলনায় বেশি।

ফজরের নামায এবং ফজরের তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাকুন। স্মরণ রাখুন, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনে এ আয়াতের টীকায় লেখেন-

“মুফাসসিরগণ এর [অর্থাৎ ‘ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ’- একথার] দুই রকম ব্যাখ্যা করেছেন:

ক. অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যেসকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালাক্রমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

খ. একদল মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসল্লীদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।”

সুতরাং ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কাম্য।

আসলে ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে না পারা বহু কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার নামান্তর।

দুই. ফজরের জামাতে উপস্থিত হতে পারা ঈমানী শক্তির পরিচায়ক

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

এশা ও ফজরের নামায মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ নামাযের পুরস্কার বা সওয়াব কত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাযে (জামাতে) হাযির হত। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫১

তিন. ফজরের নামায আদায় করুন, আল্লাহ তাআলার জিম্মায় দিনযাপন করুন

সাহাবী জুনদুব আলকাসরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ..

যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৭

ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, فِي ذِمَّةِ اللهِ অর্থ হল-

في أمان الله وفي جواره.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে থাকা।

যে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে থাকে, কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। -আলমুফহিম লিল কুরতুবী ২/২৮২

চার. ফিরিশতাগণ আল্লাহর কাছে আপনার পক্ষে সাক্ষী হবেন

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

ফিরিশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমণ করেন। এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের নামাযে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি যখন উঠে যান, তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় দেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই বান্দাদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

উত্তরে ফিরিশতারা বলেন, আমরা তাদের নামাযরত দেখে এসেছি। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩২

সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায জামাতে আদায় করছে ফিরিশতারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছে- আমরা যখন পৃথিবীতে গিয়েছি তাকে নামাযরত দেখেছি, আবার যখন পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছি তখনও তাকে নামাযরত দেখেছি। বান্দার জন্য ফিরিশতাদের এ সাক্ষ্য কত মূল্যবান! এ দুই নামাযে যত্নবান হওয়ার ফলে ফিরিশতারা এমনভাবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যেন সে সারাদিনই সালাত-ইবাদতে মগ্ন ছিল।

পাঁচ. জান্নাতের সুসংবাদ

সাহাবী আবু মূসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের (অর্থাৎ ফজর ও এশার) নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৫

জান্নাত অর্জন একজন মুমিনের পরম চাওয়া। যত ইবাদত-রিয়াযত এবং মেহনত-মুজাহাদা সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ। জান্নাত লাভের সুসংবাদ শুনতে মুমিন খুব পছন্দ করে। সুতরাং এশা ও ফজরের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি

যদি জীবনের মাকসাদ হয় নবীজীর যবানে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হওয়া। আল্লাহ সকল মুমিনকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন।

ছয়. সারা রাত ইবাদতের সওয়াব অর্জন করুন

উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত নামাযে দণ্ডায়মান থাকল। যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে আদায় করল সে যেন সারা রাত নামায আদায় করল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৬

এই হাদীসটি একজন মুমিনের জন্য বিশাল সুসংবাদ। কারণ, সারা রাত ঘুমিয়ে থেকেও রাতভর নামায আদায়ের সওয়াব আমলনামায় লেখা হচ্ছে।

দুই নামায জামাতে আদায়ের মাধ্যমে সারা রাত ইবাদতের সওয়াবের অধিকারী হতে পারা অবশ্যই একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আল্লাহ বড় মেহেরবান!

কোনো বুদ্ধিমানই এ ফযীলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না।

সাত. ফজরের নামায আদায়কারী লাভ করবে আল্লাহর দীদার

সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন-

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ - أَوْ لاَ تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَالَ: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا

.

আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহকে দেখতে কোনো প্রকার ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। যদি এ নিআমত লাভ করতে চাও, তাহলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের (অর্থাৎ ফজর ও আসরের) প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হও (কোনো প্রকার গাফলতের শিকার হয়ো না এবং শয়তানের কাছে পরাস্ত হয়ো না)। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

[এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন- সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০] -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৩; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৫১

আলোচ্য হাদীসটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার মতো বাক্য হল-

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا...

অর্থাৎ, তোমরা এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে শয়তান বা গাফলতের কাছে পরাস্ত হয়ো না।

বোঝা যাচ্ছে, আসর ও ফজরের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতা ও গাফলতের একটা বিষয় রয়েছে। এসময় মানুষ ঘুমে বা বিশ্রামে থাকে এবং গাফলতের শিকার থাকে। ফলে নফসের সাথে লড়াই করে নামাযের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এর সাথে যুক্ত হয় মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানের ওয়াসওয়াসা! শয়তান বলতে থাকে, 'আজ না হয় থাক, কাল থেকে ইনশাআল্লাহ...', 'বাসায় নামায আদায় করলেও তো হয়, সওয়াব

একটু কম হবে, কিন্তু নামায তো হয়ে যাবে' ইত্যাদি। এসব কারণে বনী আদম কাবু হয়ে যায়। পরাস্ত হয়ে যায় নফস ও শয়তানের কাছে। তাই এই দুই নামাযের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেহেতু নফস ও শয়তানের সাথে অনেক মুজাহাদা করে একজন মুমিনকে এই দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন; আল্লাহর দীদার লাভের পুরস্কার! বান্দা আপন রবকে দেখতে পাবে- এর চেয়ে বড় পাওয়া ও বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে। এ পুরস্কার লাভের জন্য তো বান্দা যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি।

আট. জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরোয়ানা

উমারা ইবনে রুআইবা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا- يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় করে সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৩৪

মানুষের বড় বড় সফলতার একটি হল, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা। জান্নাতের আশাও যেমন থাকবে, তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতিও থাকতে হবে; তবেই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

ففَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

যাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে দাখিল করা হল সে-ই সফলকাম হল। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

নয়. দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝের সবকিছুর চেয়ে দামী কিছু পেতে চাই!

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

ফজরের দুই রাকাআত নামায (আমার কাছে) দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭২৫

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ দুনিয়া কামাই করার জন্য কত পরিশ্রমই না করে। অথচ এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অতি শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। একজন মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের জীবন শুরু হবে; কিন্তু শেষ হবে না কোনোদিন- অনিঃশেষ। এই জীবনের পাথেয় হল ইবাদত ও আমল। ফজরের দুই রাকাত নামায এই অনিঃশেষ জীবনের এক মূল্যবান পাথেয়।

দশ. কিয়ামতের দিন নূরপ্রাপ্তির সুসংবাদ

আখেরাত জীবনের কঠিন কঠিন ঘাটি পার হওয়ার জন্য প্রয়োজন নূর ও আলোর। রাতের শেষ অন্ধকারে আদায় করা এই নামায আমার জন্য শেষ দিবসের আলো হবে; যা আমাকে জান্নাত পর্যন্ত পথ চলতে সাহায্য করবে; যা না হলে আমি সেখানের অন্ধকারে হারিয়ে যাব। যদি নূরের অধিকারী হতে পারি, তাহলেই পৌঁছতে পারব পরম কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে।

বুরায়দা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অন্ধকারে পায়ে হেঁটে (ফজরের নামায আদায় করতে) মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দাও- কিয়ামতের দিন তাদেরকে পরিপূর্ণ নূর দান করা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫৬১; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২৩

(২) যোহরের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

এক: যোহর প্রথম সালাত:

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় দান দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্বপূর্ণ নামাজ হলো যোহরের নামাজ। এমনকি হযরত জিব্রাঈল সর্বপ্রথম যে নামাজ আদায় করেছেন (.সা) এর ইমামতিতে রাসুল-(.আ), তা হলো যোহরের নামাজ। অর্থাৎ মিরাজ থেকে ফিরে রাসুল সর্বপ্রথম (.সা)যোহরের নামাজ আদায় করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

সাইয়ার ইবনে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া‘ সাল্লাল্লাহু) (সাল্লাম কিভাবে ফরয সালাত আদায় করতেন, এ সম্মন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতেন যাকে তোমরা প্রথম সালাত বল। -সুনানে আন নাসায়ী ৫২৫

দুই: যোহরের নামাযে অধিক নেকির সুযোগ:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন গরম বেড়ে যায় তখন তোমরা তা কমে এলে যোহরের নামাজ আদায় করো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ।’ (সহীহ বুখারী: ৫৩৬)

হাদিসের বর্ণনায় এই নামাযে কষ্টের বিবরণ রয়েছে। যেহেতু এই নামাযের সঙ্গে কষ্টের সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং তা আদায়ে নেকির পরিমাণও আল্লাহ বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেবেন ইন শা আল্লাহ।

এমনকি আল্লাহ করআনে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। (সূরা আল ইনশিরহ, আয়াত: ৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না। '(সুরা আলে ইমরান: ১৭১)

তিন: কুরআনে যোহরের নামাযের নির্দেশ ও গুরুত্বারোপ:

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা যোহরের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে, তাঁরই প্রশংসা। (সূরা আর-রূম, আয়াত: ১৭-১৮)

আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে। নিশ্চিতভাবেই সৎ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪)

চার: হাদিসে যোহরের নামাযের বর্ণনা:

হাদিসে এসেছে,

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ»

হামযাতুল আয়িযী (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেনঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) -কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন মনযিলে যোহরের পূর্বে অবতরণ করতেন তখন যোহরের সালাত আদায় না করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন না। এক ব্যক্তি বলল, অর্ধদিন ঠিক দুপুর হলেও? তিনি বললেন, ঠিক দুপুর বেলায় হলেও। - সুনানে আন নাসাঈ ৪৯৮

যোহরের ফরজ নামাজের পাশাপাশি যোহরের সুন্নত নামাজেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। যোহর নামাজের পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজ সম্পর্কে আয়েশা রা. বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই যোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ছাড়তেন না।” – সহীহ বুখারী **১১৮২**

জুমার নামায এবং এর গুরুত্ব ও ফজিলত:

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ الله آدَمَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وفيه مات، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ السّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ شَفَقًا مِنَ السّاعَةِ، إِلّا الْجِنّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ.

সূর্য যেসব দিন উদিত হয় অর্থাৎ দিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন। এদিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে দুনিয়াতে নামানো হয়েছে। এদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এ দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ও জিন ব্যতীত এমন কোনো প্রাণী নেই, যা কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুমার দিন

ভোর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে না। জুমার দিন একটা সময় আছে, কোনো মুসলিম যদি সে সময় নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। -মুআত্তা মালেক, হাদীস ২৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০৩০৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৪৩০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭২

জুমার দিনের সবচেয়ে বড় আমল তো হল, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জুমার নামায আদায় করা। ভালোভাবে পাক-পবিত্র হয়ে পরিষ্কার ও উত্তম জামা-কাপড় পরিধান করে শুরু ওয়াক্তে মসজিদে চলে যাওয়া এবং নামায ও দুআ-যিকিরে মগ্ন থাকা। এরপর একাগ্রতার সাথে ইমাম সাহেবের খুতবা শোনা এবং উত্তমরূপে জুমার নামায আদায় করা। এটাই হল, জুমার দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ফযীলতের আমল। হাদীস শরীফে এই আমলের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে।

জুমার নামাযের নিয়ম:

সময় একই হলেও যোহরের সঙ্গে জুমার নামাজের নিয়মগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। জুমার নামাজে দুই রাকাত ফরজ রয়েছে। এছাড়া ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাত কাবলাল জুমা এবং পরে চার রাকাত বাদাল জুমা (সুন্নত নামাজ) আদায় করতে হয়। জোহরের মতো কেউ চাইলে এসময় অতিরিক্ত নফল নামাজ আদায় করতে পারে। তবে এসব নফল নামাজ জুমার অংশ হিসেবে পড়া হয় না এবং তা আবশ্যকীয়ও নয় বরং ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায় করতে পারে এবং না করলে তার দোষ হয় না।

জুমার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা আবশ্যিক। ফলে জুমা একাকী আদায় করার নিয়ম নেই।

পবিত্র কোরআনে জুমার নামাজের সময় হলে কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কারণবশত (যেমন খুব অসুস্থ ব্যক্তি) জুমা আদায় করতে না পারে, তবে তার ক্ষেত্রে যোহরের নামাজ আদায় করা নিয়ম। তাছাড়া

কিছু ক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তির ওপর, যেমন মুসাফির অবস্থায় জুমার আবশ্যকতা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে যোহরের নামাজ আদায় করলে তা গ্রহণীয় হয়। তবে মুসাফির চাইলে জুমা আদায় করতে পারে।

কুরআনে জুমার নামাযের তাগিদ:

জুমার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা বলেন,

'হে মুমিনগণ ! জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি করো এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। সূরা) জুমা, আয়াত (১০-৯ :

এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হয়ে যায়:

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

এক জুমা থেকে আরেক জুমা মধ্যবর্তী সময়ের (গোনাহের) জন্য কাফফারা (পাপমোচনকারী), যদি কাবীরা গোনাহ না করা হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৪; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৮১৪

সালমান ফারসী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

>تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ<؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ثُمّ قَالَ: >تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ<؟ قُلْتُ: اللهُ عَزّ وَجَلّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ فِي الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ: هُوَ الْيَوْمُ الّذِي جُمِعَ فِيهِ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ. قَالَ: >لَكِنّي أُخْبِرُكَ بِخَبَرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ ثُمّ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمّ يُنْصِتُ، حَتّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، إِلّا كَانَتْ كَفّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الّتِي قَبْلَهَا، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.

).(قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن

তুমি জানো, জুমার দিন কী?

উত্তর দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত আছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, জুমার দিন কী?

আমি একই জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

তিনি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, বল তো জুমার দিন কী?

আমি তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বললাম, জুমা হল ঐ দিন, যাতে আদম আলাইহিস সালামকে জমা করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এসব কিছু না।) বরং আমি তোমাকে জুমার দিনের খবর (আসল ফযীলত) সম্পর্কে অবগত করছি। কোনো মুসলিম যদি পবিত্র হয়ে জামে মসজিদের দিকে হাঁটতে থাকে, এরপর ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে তাহলে এ নামায এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার গোনাহসমূহের কাফ্ফারা (মোচনকারী) হয়ে যাবে, যদি ধ্বংসকারী তথা কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। -শারহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৩৮২৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৭২৯; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১৬৭৭: মুজামে কাবীর, তবারানী ৬/২৩৭ (৬০৮৯) মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০২৮

আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطّ أَعْنَاقَ النّاسِ، ثُمّ صَلّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ، حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الّتِي قَبْلَهَا.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমাতে উপস্থিত হল, কারো কাঁধ ডিঙ্গিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী সুন্নত-নফল পড়ল, অতঃপর খতীব (খুতবার জন্য)

বের হওয়া থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তার এই নামায এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গোনাহের) কাফ্ফারা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০৪৬৫

সালমান আলখায়ের (সালমান ফারসী) রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ يُصَلّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الإِمَامُ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে, সাধ্যমত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে,৬ তেল ব্যবহার করবে বা নিজের ঘরে থাকা আতর মাখবে, এরপর জুমার দিকে বের হবে, (মসজিদে গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসবে না, যত রাকাত সম্ভব নামায পড়বে, এরপর ইমাম যখন খুতবা দেন তখন চুপ থাকবে। যে কেউই এসব করবে তাকেই এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাফ করা হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৫৫৬৩

দশ দিনের গোনাহ মাফ হয়ে যায়:

আল্লাহ তাআলা রহমত ও মাগফিরাতের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রাসূলের যবানে ঘোষণা শুনিয়েছেন, জুমার নামাযের বদৌলতে দশ দিনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمّ تَطَيّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمّ خَرَجَ إِلَى الصّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ.

জুমার দিন যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করে, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করে এবং তার জামাগুলো থেকে ভালো জামাটি পরিধান করে, তারপর নামাযের উদ্দেশে বের হয়, (মসজিদে

গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসে না, অতঃপর মনোযোগের সাথে ইমামের খুতবা শোনে, ঐ ব্যক্তির এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৪০৩

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَوَضّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে, এরপর জুমায় উপস্থিত হবে, তারপর মনোযোগ দিয়ে (খুতবা) শুনবে এবং চুপ থাকবে, তার দুই জুমার মধ্যবর্তী দিনগুলো এবং আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে কঙ্কর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১২৩১

মোটকথা, এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, জুমার দিনের বিশেষ আমল হচ্ছে, উত্তমরূপে গোসল করা, সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরিধান করা, খোশবু থাকলে ব্যবহার করা, একাগ্রচিত্তে খুতবা শোনা, মসজিদে কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সামনে যাওয়ার জন্য কাউকে ডিঙ্গিয়ে না যাওয়া এবং খুতবা চলাকালে কোনো কথা না বলা ও কঙ্কর স্পর্শ না করা তথা অনর্থক কোনো কিছু না করা।

যে ব্যক্তি এভাবে জুমার নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার এক সপ্তাহ, বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।

(৩) আসরের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

এক:আসর দিনের মধ্যবর্তী নামায:

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো আসরের নামাজ। এই নামাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কোরআনে এই নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করার ব্যাপারে বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা নামাজসমূহ ও মধ্যবর্তী নামাজের হিফাজত করো এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

বিভিন্ন হাদিস ও অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী নামাজের অর্থ হলো, আসরের নামাজ। কেননা, এর একদিকে দিনের দুটি নামাজ—ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দুটি নামায—মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের জন্য তাকিদ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মের ব্যস্ততা থাকে। সব শ্রেণির মানুষই এই সময় ব্যস্ততার মধ্যে থাকে, ফলে অলসতা বা ব্যস্ততার অজুহাতে এই নামাযটি ঠিকমতো আদায় করে না।

দুই:আসর নামায সমস্ত আমলের হিফাজতকারী:

আসরের চার রাকাত ফরজ সালাতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে হাদিস শরীফে এসেছে,

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

আবুল মালিহ (রা) হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন: একদা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুরায়দা (রাঃ) -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: অবিলম্বে সালাত আদায় করে নাও, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করলো, তার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেল। (সুনানে আন নাসায়ী: ৪৭৪)

সম্ভবত এটা এই জন্য যে এই সময় বান্দার দিনের আমলগুলো আল্লাহর কাছে উত্থাপন করা হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে বান্দার দৈনিক আমলগুলো দুই সময় আল্লাহর কাছে উত্থাপন করা হয়। আবার ওই দুই সময়েই ফেরেশতাদের পালা বদল হয়। ফেরেশতারা গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে বান্দার আমলের হিসাব দেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো আসরের সময়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত , আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। ‘আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিলেন। (সহীহ বুখারি: ৫৫৫)

তিন: আসরের নামযের আবশ্যকতা:

হাদিসে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে ‘আসরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হবার পূর্বে ফজরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। - সহীহ বুখারি: ৫৫৬

চার: আসরের সুন্নত নামাযের ফজিলত:

আসরের সালাতের আগে ৪ রাকায়াত সুন্নাত রয়েছে। এটি গাইরে মুওয়াক্কাদা, তাই আদায় করা উত্তম। রাসুল নিজেও এই নামা (.সা)য আদায় করেছেন। উমর ফারুক (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করুন, যারা আসরের সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১২৭১; তিরমিজি, হাদিস : ৪৩০)

পাঁচ: আসরের নামাযের বিবিধ ফজিলত:

বোঝা গেল, আসরের নামাজটি মুসলিমদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজ। এই নামাজের সময়ই মুসলমানরা প্রথম বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ শুরু করেন। অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটিও এই নামাজের সময়ই হয়েছিল। (বুখারি, হাদিস : ৪০)

এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও এই নামাজ ফরজ ছিল, যা আমাদের নবীজি (সা.)-এর হাদিসেই পাওয়া যায়। আবু বাসরা গিফারি (রা.) বলেন, (একবার) রাসুলুল্লাহ (সা.) 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আসরের নামাজ আদায় করলেন। (এবং) বলেন, এই নামাজ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি। যে ব্যক্তি ওই নামাজ যথাযথ আদায় করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। তার (আসর) পর শাহিদ উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো সালাত নেই। শাহিদ (অর্থ) তারকারাজি। (নাসায়ি, হাদিস : ৫২১)

(৪) <u>মাগরীবের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ</u>

এক: মাগরিবের নামাযে দেরি না করার তাগিদ:

মাগরিবের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা উচিত। বিলম্ব করা অনুচিত। হাদিস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। (সহিহ বুখারী: ৫৬১)

অন্য হাদিসে এসেছে, মারসাদ ইবনু :থেকে বর্ণিত (রহঃ) আবদুল্লাহ‘

তিনি বলেন, যখন আবূ আইউব (রাঃ) জিহাদ হতে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন, সে সময় উক্বাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের সলাত আদায়ে বিলম্ব করলে আবূ আইউব (রাঃ) উক্বাহ্ (রাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে উক্বাহ্! এটা আবার কেমন সলাত? উক্বাহ্ (রাঃ) বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেননিঃ আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সলাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। (সুনানে আবু দাউদ:৪১৮)

দুই: ফজর ও মাগরিবের নামাজের গুরুত্ব

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

আর তোমার প্রভূকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর তাসবিহ পাঠ করো (সূরা আল-ইমরান, আয়াত:৪১)

তাফসিরবিদরা বলেন, এই আয়াতে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এই আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এ দুই সময়ে প্রকৃতিতে বড় দুটো পরিবর্তন হয়। দিন ও রাতের পালাবদল ঘটে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন। (সহিহ বুখারী :৬৬২)

তিন: মাগরিবের নামাজের সুন্নতের ফজিলত

বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এমনকি উল্লিখিত হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়, মাগরিবের নামাজ অতি বরকতময়।

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। (তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২)

(৫) ইশার নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

ইশা ও ফজরের নামাযেঁর জামাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এ দুই সময়ে মানুষ সাধারণত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায় ও বিশ্রাম করে। ফলে এই দুই ওয়াক্তে জামাতে শরিক হতে যথেষ্ট অবহেলা ও গাফিলতি হয়ে থাকে। এ জন্য হাদিসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইশার নামায আদায়ের ফজিলত বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এক: অর্ধেক রাত ইবাদত করার সওয়াব

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ইশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭) অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।’ (মুসলিম, হাদিস: ৬৫৬)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সত্তার হাতে আমার জান তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ জোগাড়ের আদেশ দেই। তারপর সালাতের আযান দেয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামত করতে বলি।

অতঃপর আমি জামা'আতে আসেনি এমন লোকেদের কাছে যাই আর তাদেরসহ তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি গোশতওয়ালা হাড় কিংবা দু'টি বক্রীর ক্ষুরের গোশত পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হাযির হত। (সহিহ বুখারী: ৭২২৪)

দুই: মুনাফিকের তালিকা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৫৭)

উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একবার মহানবী (সা.) আমাদের ফজরের নামাজ পড়িয়েছেন। সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তারপর আরেকজনের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তিনি বলেন, এ দুই নামাজ (ইশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। তোমরা যদি জানতে যে এই দুই নামাজে কী পরিমাণ সওয়াব আছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরিক হতে।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৫৫৪)

তিন: ইশার সুন্নত নামাজের ফজিলত

ইশার নামাজের চার রাকাত ফরজের পরে দুই রাকাত সুন্নত খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইশার পরের দুই রাকাত সুন্নতের ফজিলত সম্পর্কে হজরত আয়েশা(রা) বলেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক ১২ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নিয়মিত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। ১২ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলোজোহরের আগে চার রাকাত–, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং ফজরের আগে দুই রাকাত। '(তিরমিজি ৪১৪)

বিবিধ: রাতের শেষ নামায :

হাদিসে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রাতের নামায দুই দুই রাক’আত (করে আদায় করতে হয়)। তুমি যদি ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় কর তবে এক রাক’আত করে বিতর পূর্ণ করে নাও। বিতর নামাযকেই তোমার সর্বশেষ নামায কর। সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(১৩১৯, ১৩২০), বুখারী ও মুসলিম।

শেষ রাতেই বিতরের নামায পড়া সম্ভব নাহলে ঘুমানোর পূর্বে পড়া:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى أَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي قَتَادَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوِتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ) -কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিতর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, তিনি রাতের সকল ভাগেই বিতর আদায় করেছেন, হয় রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে অথবা শেষ ভাগে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিতর ভোর রাত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। -সহীহ। ইবনু মাজাহ- (১১৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায কায়েম না করা এবং নামাযে উদাসীনতার পরিণতি:

কোনো কাজের উপর গুরুত্বারোপের একটি পদ্ধতি হল, কাজটি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আরেকটি পদ্ধতি হল, কাজটি না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করা। কোনো কিছুর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এ দুই পদ্ধতির যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়। তবে তা পূর্ণতা পায় যখন উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিতও করেছেন এবং নামায না পড়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছেন

এক: মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা

নিফাক ও কপটতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআনে মুনাফিকদের কপটতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে। -সূরা নিসা (৪) : ১৪২

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের চারটি চরিত্র তুলে ধরেছেন-

ক. তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে।

বলাবাহুল্য, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু মুনাফিকরা কপটতা করে মনে করে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিয়ে ফেলছে; আল্লাহ তাদের কপটতা সম্পর্কে অবগত নন!

খ. তারা অলসতার সাথে নামায পড়ে। নামাযকে বোঝা মনে করে।

গ. তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে; আল্লাহর প্রতিদানের আশায় কিংবা তাঁর আযাবের ভয়ে নয়।

ঘ. তারা নামাযে আল্লাহ্কে খুব সামান্যই স্মরণ করে। অথচ নামায হচ্ছে আগাগোড়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যিকিরপূর্ণ সেই ইবাদতেই তারা আল্লাহকে অল্প স্মরণ করে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় তারা কত অলস ও উদাসীন!

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

তাদের দান কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এটা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা নামাযে আসে (চরম) অলসতার সাথে এবং তারা ব্যয় করে (খুব) অনিচ্ছার সাথে। -সূরা তাওবা (৯) : ৫৪

এ আয়াতে মুনাফিকদের নিফাকের তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে।

হাঁ, মুনাফিকরা আসলে কাফের। তাদের মধ্যে আর অন্য কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, অন্য কাফেররা অন্তরের মত মুখেও ইসলামকে অস্বীকার করে আর তারা অন্তরে অবিশ্বাস করে মুখে বিশ্বাসের কথা বলে।

খ. তারা চরম অলসতার সাথে নামাযে আসে।

গ. তারা আল্লাহর পথে খুব অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنُ.

দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা মানুষকে দেখায় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও দেয় না। -সূরা মাঊন (১০৭) : ৪-৭

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন। নামাযের প্রতি, নামাযের ওয়াক্তের প্রতি যাদের গুরুত্ব নেই। যারা ইচ্ছা করে বিনা ওজরে নামাযের সময় নষ্ট করে। আর যাই পড়ে কেবল মানুষের ভয়ে পড়ে। যেখানে মানুষের ভয় নেই সেখানে নামায ছেড়ে দেয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা করে মুমিন বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তারা যেন আগ্রহ, উদ্যম ও যত্নের সাথে নামায পড়ে এবং তাঁকে স্মরণ ও সন্তুষ্ট করার জন্য পড়ে। নামাযের ব্যাপারে অলসতা, উদাসীনতা ও লৌকিকতা না করে। নামাযে সঙ্গে এহেন আচরণের পরিণতি দুর্ভোগ।

দুই: কাফেরদের কুফরী ও নামায না পড়ার উপর ভর্ৎসনা

আল্লাহ কুরআনে কাফেরদের অনেক ভর্ৎসনা করেছেন। এক জায়গায় তাদের নিন্দা করে বলেছেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى، ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى، اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى، ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.

সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতঃপর সে দম্ভ করতে করতে তার পরিবারের কাছে চলে গেছে। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। অতঃপর দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। -সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ৩১-৩৫

এ আয়াতে কাফেরের ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, সে ঈমানও আনেনি এবং নামাযও পড়েনি; বরং কুফরী করেছে এবং আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উপরন্তু এগুলোর জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই; বরং সে অহংকারের সঙ্গে চলে। আয়াতটির শেষে এই কাফেরদেরকে উপর্যুপরি দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কাফেরের নিন্দার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে কুফরী করেছে; ঈমান আনেনি। আর ঈমান ছাড়া আমলের (তা যত বড়ই হোক) কোনো মূল্য নেই। আয়াতটিতে কাফেরের কুফরীর পাশাপাশি

নামায না পড়ার নিন্দা করা নামায তরক করার ভয়াবহতা তুলে ধরে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায না পড়া গুরুতর পাপ। সকলের উচিত দম্ভ-অহংকার ছেড়ে ঈমান আনা, নামায পড়া। পক্ষান্তরে ঈমান ও নামায থেকে বিমুখ থাকা আল্লাহর কাছে অতি নিন্দনীয় এবং এর পরিণতি ভয়াবহ।

তিন: জাহান্নামীদের নামায না পড়ার স্বীকারোক্তি

কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে। এরকম একটি আলাপ সূরা মুদ্দাসসিরে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِيْ جَنّٰتٍ ۛيَتَسَآءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ.

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে গেল। -সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৪০-৪৭

এখানে জান্নাতীদের জিজ্ঞাসার জবাবে জাহান্নামীরা নিজেরাই তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে দিয়েছে। তাদের এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট যে, নামায না পড়া, সম্পদের হক আদায় না করা, অসার কথাবার্তায় জড়িত হওয়া এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করার পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ কুরআনে জাহান্নামীদের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করছেন- তারা যেন জাহান্নামীদের পথে না চলে। বরং তারা ঈমান আনে। নামায পড়ে। সম্পদের হক আদায় করে। অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে।

চার: নামায নষ্ট করার নিন্দা

আল্লাহ সূরা মারইয়ামে হযরত যাকারিয়া আ., ইয়াহইয়া আ., ঈসা আ., মূসা আ., হারূন আ., ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ., ইসহাক আ., ইদ্রিস আ.-এর আলোচনা করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নবী ছিলেন। তাঁদের আলোচনার শেষে আল্লাহ বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তাদের পরে অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এল, যারা নামায নষ্ট করে ফেলল এবং খাহেশাতের পেছনে পড়ে গেল। সুতরাং তারা শীঘ্রই গোমরাহীর (পরিণামের) সম্মুখীন হবে। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৯

এ আয়াতে ওই নবীদের পরে আসা অযোগ্য জাতি-গোষ্ঠীর নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় মেতে উঠেছে এবং নামায নষ্ট করে ফেলেছে। নামায নষ্ট করার একটি ভয়াবহ দিক হল নামায একেবারে না পড়া। এমনিভাবে সময়ের ভেতর না পড়াও নামায নষ্ট করারই অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াত থেকে অনুমান করা যায়, নামায নষ্ট করা কত গুরুতর গোনাহ। এর কারণে এত কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এটা আমাদেরকে এই বার্তা দেয়, নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে এবং সময়মত নামায পড়তে হবে। নামায নষ্ট করা যাবে না। নামায নষ্ট করা গোমরাহী।

আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, পার্থিব বিলাসিতা এবং নফসের খাহেশাতে মত্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ এর ফলে মানুষ আল্লাহ থেকে গাফেল ও বিমুখ হয়ে যায়।

পাঁচ: নামায বা সালাত হলো মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি

সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ

“একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।” - সহীহ মুসলিম ১/৮৮

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَرَ

“যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।” (ইবনু হিব্বান, আস৪ সহীহ-/৩২৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১১৩৭/, ১৩৯। হাদীসটি হাসান।)

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মূসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না।

সালাত কাযা করাকে “কুফরী” গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশী গুনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না।

আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত।

সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ ৫/১৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব সুনান-করাকে কুফরি মনে করতেন না।" (তিরমিযী, আস) ১৩৭/১

ছয়: চার ইমামের মন্তব্য

ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগ্যের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদণ্ড- প্রদান করতে হবে।

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ(

"ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।" (হাদীসটি সহীহ। হাকিম, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১২৯৫/; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১১৩৯।)

সাত: এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

নাম কাটা যাওয়ার পরে তো আর উম্মাত হিসেবে কোনো দাবিই থাকে না। ক্ষমা বা শাফাআত লাভের আশাও থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

"কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ত্রুটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে। (তিরমিযী, আস সুনান-২/২৬৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১৯০।)

সুন্নত নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে রাকাত সুন্নত নামাজ ১২ পরে-রয়েছে, যার গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নত বলা হয়, ওই আদেশমূলক বিধানকে, যা ফরজ ওয়াজিবের মত অপরিহার্য না হলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত আমল থেকে তা প্রমাণিত। -*(ফিকহুস সুন্নাহ, ১৬০)*

যেসব সুন্নত ফরজ নামাজের আগে-পরে পড়া হয় তা হল দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল, সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দ্বিতীয় হল, সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা।

সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলা হয় ওই সুন্নতকে, যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত এমনভাবে আমল করতেন যে তা ওজরবিহীন (বিশেষ অপারগতা) কখনও ছাড়তেন না। যেমন, পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়া, জামাতের জন্য আজান দেওয়া, জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত ইত্যাদি।

এই ইবাদতের বিধান হলো—ওজরবিহীন নিয়মিত ছেড়ে দেওয়া গুনাহ, তবে প্রয়োজনে হঠাৎ ছাড়তে পারে। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা হবে, তবে ফাসিক বা কাফির বলা যাবে না।

সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা বলা হয় ওই সুন্নতকে যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আমল করলেও ওজরবিহীন মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিতেন। তাকে মুস্তাহাব, নফল, মানদুবও বলা হয়। এর বিধান হলো—এগুলোর ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। তবে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল সদকা ও নফল হজ, পরোপকার করা ও জনসেবামূলক কাজ করা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের আমলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো আমল অন্য আমলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, মুস্তাহাব-নফলের চেয়ে সুন্নতে জায়েদা তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ। *(কাশফুল আসরার : ২/৩০২)*

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব:

ফরজ নামাজ সময়মতো আদায় করা সবার জন্য আবশ্যক। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ঠিকমতো আদায় না করলে আল্লাহর কাছে এর হিসাব দিতে হবে। নামাজ আদায়ে গড়িমসি করার কারণে মানুষকে জাহান্নামেও যেতে হবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

'জাহান্নামিদের জিজ্ঞাসা করা হবে কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।' – সূরাহ মুদ্দাসসির আয়াত: ৪২-৪৩

ফরজ নামাজ আদায়ে তাই সবার যত্নশীল হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি প্রত্যেক নামাজের আগে পরের সুন্নত নামাজগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা উচিত। কারণ, সুন্নত নামাজ আদায় করা ফরজ না হলেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কারও ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সবার আগে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হল নামাজ। নামাজ ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নইলে (নামাজ ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ফরজ নামাজে কোনও কমতি দেখা (হিসাবের সময়)গেলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল অতএব 'আছে কি না। (নামাজ) তার নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অন্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।' *-(সুনানে আবু দাউদ, ৭৭০, তিরমিজি, ৩৩৭, ইবনে মাজাহ, ১১৭)*

সুন্নত নামাযের ফজিলত:

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত। *-(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/ ৪৪০,৪৪৫)*

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত:

সর্বোপরি ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে সর্বদা নফল ইবাদত পালন করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত। এছাড়া আল্লাহর কাছে অধিকতর নৈকট্য, পুরস্কার, মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের মাধ্যমই হলো ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"আমার নৈকট্যের জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালনই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ) এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি।"(সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।)

নফল ইবাদতগুলির মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ বিষয়ে সাহাবীগণের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

"তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।" (মুসলিম, আস সহীহ ১/৩৫৩)

রাবীয়া ইবনু কা'ব নামক এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক জান্নাতে থাকতে চান বা জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন:

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।" (মুসলিম, আস সহীহ ১/৩৫৩)

কিছু বিশেষ ফজিলতপূর্ণ নামায:

(১) দুই ঈদের নামায:

দু'ঈদের সালাত শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

ঈদের সালাত দীন ইসলামের অন্যতম বাহ্যিক নিদর্শন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে রমযান মাসের সাওম পালন ও আল্লাহর ঘরের হজ আদায়ের মাধ্যমে মহান মালিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। এছাড়াও ঈদে রয়েছে মুসলিমের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা, বহু লোকের সমাবেশ ও আত্মার পবিত্রতার আহ্বান।

ঈদের সালাতের হুকুম:

ঈদের সালাত ফরযে কিফায়া, অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে এলাকার সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলিফাগণ এ সালাত সর্বদা আদায় করেছেন। আর সব মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। শরী'আত মুকিম লোকদের জন্য এ সালাত বিধিবদ্ধ করেছেন; মুসাফিরের জন্য নয়।

ঈদের সালাতের শর্তাবলী:

জুমু'আর সালাতে যেসব শর্ত রয়েছে ঈদের সালাতেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। তবে ঈদের দুই খুৎবা সুন্নাত এবং এ খুৎবাদ্বয় সালাতের পরে দিতে হয়।

ঈদের সালাতের ওয়াক্ত:

প্রত্যুষে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এ সালাত পড়া যায়। ঈদের দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যদি ঈদের দিন সম্পর্কে জানা যায় তাহলে পরের দিন এ সালাত যথাসময় কাযা করবে।

ঈদের সালাতের পদ্ধতি:

ঈদের সালাত দুই রাকাত। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«صلاة الفطر والأضحى ركعتان، ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى»

“ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে সে দুই রাকাতই পূর্ণ সালাত; সংক্ষেপ নয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে নতুন কিছু রটনা করলো সে বিফল হলো”।[1] এ সালাত খুৎবার আগে পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ও আউযুবিল্লাহ এর আগে ছয় তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত পড়ার আগে পাঁচ তাকবীর বলবে।

ঈদের সালাত আদায়ের স্থান:

ঈদের সালাত মাঠে আদায় করতে হয়, তবে প্রয়োজনে মসজিদে আদায় করাও জায়েয।

ঈদের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

হাদিস শরীফে ঈদের নামাযের বর্ণনা:

ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কখনো ‘ঈদের মাঠে গমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গেছি। তবে তাঁর নিকট আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হবার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইব্‌নু সালাতের বাড়ির নিকট যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (সালাত আদায়ের) পরে খুত্‌বা দিলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায ও নসীহাত করেন। এবং তাদের সদকা করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকলেন। অতঃপর নবী ও বিলাল (রাঃ) বাড়ি পৌছালেন। (সহিহ বুখারী৮৬৩ :)

অপর হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ، الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ " لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبابهَا ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.

উম্মু ‘আতিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিবসে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন নারীদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা’আত ও দু’আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী নারীগণ সালাতের জায়গা হতে দূরে অবস্থান করবে। এক মহিলা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেনঃ তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না পরিয়ে দেয়া। (আধুনিক প্রকাশনীঃ৩৩৮, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪৪) ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু রাজা’ (রহঃ) সূত্রে ‘আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। (সহিহ বুখারী ৩৫১)

অপর হাদিসে এসেছে,

বারা'আ ইব্‌নু ‘আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘ঈদুল আযহার দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশে খুত্‌বা দান করেন। খুত্‌বায় তিনি বলেনঃ যে আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবাণী করল, সে কুরবাণীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবাণী করল তা সালাতের পূর্বে হয়ে গেল, এতে তার কুরবাণী হবে না। (সহিহ বুখারী ৯৫৫)

(২) তাহাজ্জুদ:

বড় কেউ যদি কাউকে স্মরণ করে, সে গর্বিত হয় এবং নিজেকে ধন্য মনে করে। বরেণ্য কোনো মনীষী যদি কাউকে ভালবাসে, কাছে টেনে নেয়, সে যারপরনাই আনন্দিত হয়। তাহলে ঐ সব মানুষের কত বড় সৌভাগ্য, স্বয়ং রাব্বুল আলামীন যাদের ভালবাসেন, যাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন!

হাঁ, কিছু ভাগ্যবান মানুষ আছেন, আল্লাহ তাআলা যাদের প্রশংসা করেন, তাদের আমল নিয়ে গর্ব করেন। যেসব খোশকিসমত বান্দা রাতের শেষ প্রহরে আরামের বিছানা ত্যাগ করে আপন রবের সামনে দাঁড়িয়ে যায়, ঘুমের আরাম ঝেড়ে ফেলে রোনাযারি ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হয়ে যায়, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের মহব্বত করেন, তাদের প্রশংসা করেন; এমনকি তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন।

তাহাজ্জুদ রাতের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে বলা হয় তাহাজ্জুদ বা তাহাজ্জুদের সালাত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ফরজ সালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হলো রাতের নামায।

তাহাজ্জুদ : ইবাদুর রাহমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

‘ইবাদুর রহমান’ তথা দয়াময় আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপাধি। দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। যারা এই মহিমান্বিত অভিধায় ভূষিত হবেন তাদের একটি গুণ হল, তারা রাতের শেষ সময়টাকে রহমানের ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا، وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

তারা রহমানের বান্দা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে। এবং যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান (কখনো) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনো) অবস্থায়।-সূরা ফুরকান : (২৫)৬৩-৬৪

রাব্বুল আলামীন যাদের প্রশংসা করেছেন: রাতের তাহাজ্জুদ আদায় আল্লাহর নেক বান্দাদের গুণ ও এটা মুত্তাকী লোকদের সিফাত। তাহাজ্জুদ গুজারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(ক) "যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়।" (সূরা ২৫; ফোরকান ৬৪)

(খ) "মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের মাঝে থাকবে। তারা উপভোগ করতে থাকবে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা কিছু দেবেন। পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মশীল।- তারা রাতের অল্প সময়ই নিদ্রায় অতিবাহিত করত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফারে রত থাকত।" (সূরা যারিআত ১৮-১৫ : (৫১))

(গ) "তাদের পিঠ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশি রাতে আযাবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। কোন মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলত) তাই হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার।" (সূরা ৩২; সাজদা ১৬-১৭)

(ঘ) "যারা রাতভর আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা (তাঁর জন্যে) সাজদা করে।" (সূরা ৩; আলে-ইমরান ১১৩)

(ঙ) "ঊষালগ্নের পূর্বে আল্লাহর কাছে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" (সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৭)
(চ) "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তাআলার)

ইবাদত করে সে পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে।" (সূরা ৩৯; যুমার ৯)

তাছাড়া তাহাজ্জুদের শানে আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বলেন,

(১) "হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মুহাম্মাদ)! রাতে (নামাযের জন্যে উঠে) দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে তার অর্ধেক অংশ- অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম করো, কিংবা তার ওপর (আবো কিছু) বাড়িয়ে দাও, আর তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো থেমে থেমে।" (সূরা ৭৩; মুযাম্মিল ১-৪)

(২) "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (নামায আদায় করো), এটা তোমার জন্যে (ফরয নামাযের) অতিরিক্ত, আশা করা যায় (এর দ্বারা) তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় পৌছে দেবেন।" (সূরা ১৭; বনী ইরাঈল ৭৯)।

(৩) "তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো, রাতের একাংশ তার সামনে সাজদাবনত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো।" (সূরা ৭৬; দাহর ২৫-২৬)

(৪) এ ছাড়াও আরো ক'টি আয়াতে আল্লাহর তার প্রিয় হাবীবকে তাহাজ্জুদের আদেশ নিয়েছেন। নবী করীম (স) ও এ সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহিত করে বলেছেন, রমযানের পর সবোত্তম সিয়াম হলো মুহররম মাসের সিয়াম এবং ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত। (মুসলিম)

তাহাজ্জুদের ফযীলত:

হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

১. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) এ সালাত আদায়ে এত গুরুত্ব দিতেন যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার দু'পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনারতো আগে পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (এরপরও আপনি এত কষ্ট কেন করছেন ?) [তিনি বললেন]
"আমি কি (তার) কৃতজ্ঞ বান্দা হলো না?" (বুখারী: ৪৮৩৬, ৪৮৩৭)

২. জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় - "হে মানুষেরা! তোমরা বেশি বেশি সালাম দাও, মানুষকে খানা খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন (সেই রাত নিশিতে তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় কর। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (ইবনে মাজাহ: ৩২৫১)

৩. জান্নাতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কক্ষ লাভ করবে: জান্নাতে এমন কিছু প্রাসাদ রয়েছে যেগুলোর ভিতর থেকে বাইরের এবং বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যাবে। এসব কক্ষবিশিষ্ট জান্নাত পাবে তারা যারা উত্তম ও নরম ভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ায়। নিয়মিত (নফল-সুন্নাত) সিয়াম পালন করে, বেশি বেশি সালাম দেয় এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা তাহাজ্জুদ পড়ে।(তিরমিযী: ২৫২৭, আহমাদ- ৫/৩৪৩)

৪. গোনাহ মাফের বড় উপায়: তাহাজ্জুদের সালাত আদায়- এটা ছিল পূর্ববর্তী যামানার নেক

বান্দাদের অভ্যাস, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, গোনাহের কাফফারা এবং রোগমুক্তি (ও সুস্থ থাকার) উপায় (তিরমিযী: ৩৫৪৯)

৫. ফরজের পর এটা সর্বোত্তম সালাত: রমযানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো, মুহাররম মাসের সিয়াম এবং ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদের সালাত।(মুসলিম)।

৬. তাহাজ্জুদ হলো মুমিন বান্দার সম্মানবৃদ্ধিকারী ইবাদত। (হাকেম- ৪/৩২৫)

৭. তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এক মহা গনীমত। “যে ব্যক্তি রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাতে দশটি আয়াত পড়বে সে আর গাফেলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে (এ সালাতে) একশটি আয়াত পড়বে তার নাম আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি এ সালাতে এক হাজার আয়াত পড়বে তার নাম অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে।” (আবু দাউদ: ১৩৯৮)। এসব ফযীলতের সাথে কুরআন কারীমেও আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদ গোজারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তারা যে পূর্ণ ঈমানদার বান্দা সে টিকেটও দিয়েছেন। (দেখুন সূরা ফুরকান: ৬৪, সূরা আস সাজদা: ১৫-১৭)।

৮. সে সময়টি দু'আ কবুলের উত্তম মুহূর্ত: রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে নেমে আসেন আর মানুষকে এই বলে আহবান করতে থাকেন যে, কে আছে এখন আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিব। কে আছে আমার কাছে এখন ক্ষমা চাইবে; আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ভাের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে তিনি ডাকতে থাকেন।(বুখারী)

৯. আল্লাহ তাআলা তাদের ভালবাসেন: বান্দা আল্লাহকে ভালবাসবে, আল্লাহ বান্দাকে ভালবাসবেন- এটাই তো বান্দার দিলের তামান্না, মুমিনের হৃদয়ের প্রত্যাশা। যারা শেষ রজনীতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়, তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকে, তারা আল্লাহ তাআলার ওলী হয়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে আপন মহব্বত ও ভালবাসায় সিক্ত করেন।

আবু যর গিফারী রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ.

তিন শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন।

এরপর ঐ তিন শ্রেণির বিবরণ দিয়েছেন। তাদের এক শ্রেণি হলেন, যারা রাতের শেষভাগে ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে, এমনকি সফর ও ক্লান্তির হালতেও। হাদীস শরীফের ভাষ্য হল-

وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِه، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي.

এক কাফেলা রাতভর সফর করেছে। সফর করতে করতে যখন দুনিয়ার সবকিছু থেকে ঘুম তাদের প্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন যাত্রা বিরতি দিয়েছে এবং (বিছানায়) মাথা রেখেছে। এ অবস্থায় তাদের একজন নামাযে দাঁড়িয়ে আমার কাছে অনুনয়-বিনয় করছে এবং আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৩৫৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫৬৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৬১৫; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ২৪৫৬

আল্লাহ তাআলা তাদের নিয়ে গর্ব করেন

আল্লাহ তাআলা যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, পরামর্শ আকারে ফেরেশতাদের সামনে বিষয়টি পেশ করলেন। ফেরেশতাগণ বললেন, এরা তো যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, খুনখারাবি করবে। আপনার স্তুতিগান ও উপাসনার জন্য তো আমরাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা সংক্ষিপ্ত বাক্যে সারগর্ভ জবাব দিয়েছিলেন যে, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

এখন বান্দা যদি এমন কোনো কর্ম সম্পাদন করে, যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি নিরলস আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি-মহব্বত যাহের হয়, তখন আল্লাহ তাআলা খুশি হন এবং ফেরেশতাদের সাথে তার আলোচনা করেন। এই ধরনের মহৎ আমলের একটি হল রাতের শেষ অংশের আমল। যারা রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তাদের নিয়ে গর্ব করেন, ফেরেশতাদের সামনে তাদের আলোচনা করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلَيْنِ :

مِنْ رَجُلٍ ثَارَ مِنْ لِحَافِه وَفِرَاشِه مِنْ بَيْنِ حِبِّه وَأَهْلِه إِلَى صَلَاتِه، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِه: يَا مَلَائِكَتِيْ، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، قَامَ مِنْ بَيْنِ فِرَاشِه وَلِحَافِه مِنْ بَيْنِ حِبِّه وَأَهْلِه إِلَى صَلَاتِه، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي...

আমাদের রব আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত খুশি হন (তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হল)-

ঐ ব্যক্তি, যে লেপ ও বিছানা ছেড়ে নিজের প্রিয়মানুষ ও পরিবারের মাঝ থেকে (শেষ রাতে) নামাযের জন্য উঠে গেছে।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! আমার এ বান্দার প্রতি লক্ষ কর। সে লেপ ও বিছানা ছেড়ে নিজের প্রিয়মানুষ ও পরিবারের মাঝ থেকে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, আমার নিআমতের আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে!... -মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৫৩৬১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৯৪৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৫৮

১০. যে সময় উন্মুক্ত হয় রহমতের দুয়ারসমূহ

রাতের শেষ প্রহর খায়ের ও কল্যাণের আধার। এসময় উন্মুক্ত হয় আল্লাহর দয়া ও দানের প্রশস্ত দুয়ার। আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের সাগরে যেন জোয়ার আসে। তিনি বান্দার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন। বান্দাকে দান করার জন্য, বান্দার গুনাহ মাফ করার জন্য এবং বান্দার হাজত ও প্রয়োজন পুরা করার জন্য ডাকতে থাকেন।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.

আমাদের রব আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ, আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব! কে আছ, আমার কাছে (কিছু) চাইবে, আমি তাকে দান করব! কে আছ, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের বর্ণনায় এ-ও এসেছে যে-

فَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ.

আল্লাহ তাআলা এভাবে ঘোষণা করতে থাকেন, সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৫৯২; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৪৬

১১. তাহাজ্জুদ বহুবিধ কল্যাণের মাধ্যম

যুগে যুগে যারা আল্লাহকে মহব্বত করেছেন, আল্লাহর ওলী হয়েছেন, কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ ও শেষ রাতের যিকির-ইস্তিগফার ছিল তাদের একটি প্রিয় আমল। এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতের যারা সালেহ তথা নেককার বান্দা ছিলেন তারাও কিয়ামুল লাইলের প্রতি বেশ যত্ন নিতেন। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর পরম নৈকট্য লাভ হয়, গুনাহ মাফ হয় এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়!

আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّه دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

তোমরা অবশ্যই তাহাজ্জুদের পাবন্দী করবে। কেননা, তাহাজ্জুদ ছিল পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস। এ নামায তোমাদেরকে আপন রবের নৈকট্য দান করে, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা

করায় এবং তোমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস **১১৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬**

হাসসান ইবনে আতিয়্যা রাহ. বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، خَيْرٌ لَه مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ (إسناده مرسل قوي)

রাতের গভীরে দুই রাকাত নামায দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি তাদের ওপর শেষ রাতের দুই রাকাত নামায ফরয করে দিতাম। -আযযুহ্দ ওয়ার রাকাইক, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, হাদীস **১২৮৯**

১২. নবীজী আপনজনকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিতেন

কিয়ামুল লাইলের ফযীলত ও বরকত অনেক। এর প্রাপ্তি ও পুরস্কার বেশুমার। এ থেকে গাফেল থাকা অনেক বড় মাহরূমি ও বঞ্চনার কারণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন তাঁর আপনজন ও প্রিয় মানুষেরা যেন এ বরকত ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই তাহাজ্জুদের সময় তিনি পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে লক্ষ করলেন, আলী রা. ও ফাতেমা রা. তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হননি। তাদেরকে জাগানোর জন্য তিনি পরপর দুইবার গিয়েছেন। প্রথমবার জাগানোর পর ওঠেননি। তাই পরে গিয়ে আবার জাগিয়েছেন। শুনুন সেই বিবরণ আলী রা.-এর যবানে।

আলী রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে আমি ও ফাতেমার (ঘরের) কাছে এসে (বাহির থেকে ডাক দিয়ে) বললেন-

أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟

আরে! তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড়বে না?

-সহীহ বুখারী, হাদীস ১১২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭৫

হাদীসটির আরেক বর্ণনায় এসেছে, আলী রা. বলেন-

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِه فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْنَا، فَأَيْقَظَنَا وَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيَا

এক শেষ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও ফাতেমার ঘরে এলেন এবং নামাযের জন্য ডেকে দিলেন। আমাদের জাগিয়ে তিনি চলে গেছেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ নামায পড়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমাদের কোনো সাড়া-শব্দ পাননি, তাই আবার এলেন এবং আমাদের জাগালেন। বললেন, ওঠো, নামায পড়।... -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭০৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৬১২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১১৩৯

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরও তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করতেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. বলেন, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানীর হালতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং বললেন-

سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ -يُرِيدُ أَزْوَاجَه لِكَيْ يُصَلِّينَ.

'সুবহানাল্লাহ'! আল্লাহ তাআলা কত খাযানা নাযিল করেছেন! এবং কত ফেতনা অবতীর্ণ হয়েছে! কে আছে, কক্ষবাসিনীদের তথা তাঁর স্ত্রীদের তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য জাগিয়ে দেবে! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৬৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৯৬

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অনেক ফেতনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আরো বুঝে আসে, ফেতনা থেকে বাঁচার বড় একটা মাধ্যম হল তাহাজ্জুদের নামায।

(৩) তাহিয়্যাতুল ওজু:

ওযু এবং গোসলের পর এ সালাত আদায় করতে হয়। অন্যান্য নফল সুন্নাতের মতোই এ দু'রাকআত সালাত। যখনই ওযূ বা গোসল করবে ওযুরাকআত এ’গোসল শেষে তখনই দু- সালাত আদায় করা। আর এ সালাত দিনে ও রাতে যেকোন সময় আদায় করা যায়।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ ◌ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ".

আবূ কাতাদা ইবনু রিব’আ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু’রাক’আত সালাত (তাহিয়্যাতুল–মসজিদ) আদায় করার পূর্বে বসবে না। (আ.প্র. ১০৮৯, ই.ফা. ১০৯৪) (সহিহ বুখারী১১৬৩ :)

অন্যত্র হাদিসে এসেছে,

জাবির ইবনু :থেকে বর্ণিত (রাঃ) আবদুল্লাহ‘

তিনি বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু‘আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক এসে উপস্থিত হল। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায আদায় করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ ওঠো এবং নামায আদায় কর। -সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (১১১২), বুখারী ও মুসলিম।

তাহিয়্যাতুল ওযুর ফজিলত:

(১) **গুনাহ মাফ:** ‘উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি ‘উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি মাসজিদের বারান্দায় ছিলেন। এমন সময় ‘আসর সলাতের জন্যে মুওয়াযযিন তাঁর নিকট আসলে তিনি ওযূর পানি চাইলেন এবং ওযূ করে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে

একটি হাদীস শুনাব, যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে হাদীসটি শুনাতাম না। (অতঃপর তিনি বললেন) আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে সলাত আদায় করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (ই.ফা. ৪৩১, ই.সে. ৪৪৭)

(২) জান্নাতের প্রতিশ্রুতি:

‘উকবাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমার ওপর উট চড়ানোর দায়িত্ব ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, “যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ রেখে দু রাক’আত সলাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। ‘উকবাহ্ বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলামঃ বাহ! হাদীসটি কত চমৎকার! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরও উত্তম। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি ‘উমার। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে দেখেছি, এ মাত্র এসেছো। রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগে বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযু করে এ দু’আ পড়বে- “আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ”। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (ই.ফা. ৪৪৪, ই.সে. ৪৬০) (সহিহ মুসলিম৪৪১ :)

(৩) মর্যাদা বৃদ্ধি:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ " يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ ". قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক যে ‘আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে (মি’রাজের রাতে) আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তুষ্টিব্যঞ্জক হয় এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাক্‌দীরে লেখা ছিল। (সহিহ বুখারী: **১১৪৯**)

(৪) তাহিয়্যাতুল মসজিদ:

মসজিদে প্রবেশ করে যে নামাজ পড়তে হয় ইসলামের পরিভাষায় তা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ নামে পরিচিত। অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা মসজিদে এসে প্রথমে একটু বসেন তারপর নামায শুরু করেন। এটি ঠিক নয়। বরং মসজিদে গিয়ে প্রথম কাজ হবে নামায। এই নামাজের ফজিলত বিষয়ে আবু কাতাদা সালামি রা. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ "

তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ যখন মসজিদে আসে, তখন বসার পূর্বে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে। সহীহ। ইবনু মাজাহ **১০১৩**, বুখারী ও মুসলিম, তিরমিযি

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

উমার ইবনু উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত:

আবুন নাযর বলেন, আবূ সালমা ইবনু আব্দুর রহমান (র) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমার মনিবকে অর্থাৎ আজাদীদাতাকে কখনও দেখিনি যে, তিনি মসজিদে এসে (বসার পূর্বে) নামায অর্থাৎ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) না আদায় করে বসেছেন। আবুন নাযর (র) বলেন, তিনি উমার

ইবনু উবায়দুল্লাহ (র)-কে অভিযোগস্বরূপ এটা বলেছেন, কারণ তিনি মসজিদে প্রবেশ করে নামাযের পূর্বে বসে যেতেন। (হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) একক ভাবে বর্ণনা করেছেন) ইয়াহইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলেছেন, এইরূপ করা ভাল, তবে ওয়াজিব নয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ৩৭৫)

এর বিপরীতে শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহদের মতে, নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে ঢুকলেও পড়বে। ’তাহিয়্যাতুল মসজিদ‘

হানাফি মাজহাব মতে, মুসল্লি যেকোনো উদ্দেশে মসজিদে প্রবেশ করলে এবং সে পবিত্র অবস্থায় থাকলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করবে।

সময় কম হলে করণীয়

যদি কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, সময় বেশী নেই। এখনর "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" পড়তে গেলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়া যাবে না কিংবা ফরয নামাজ ছুটে যাবে, তাহলে সে তখন "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" পড়বে না; বরং সুন্নাত বা ফরজ নামাজ আদায় করবে এবং সুন্নাত বা ফরয নামাজের মধ্যেই "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" - এর নিয়ত করবে। ইনশাআল্লাহ, এর দ্বারা সুন্নাত এবং ফরয আদায়ের সাথে সাথে "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" এর সাওয়াবও লাভ হবে।(আহকামে যিন্দেগী)

তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখুলুল মসজিদ এক সাথে আদায় করাঃ

ওযু করার পর মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত নফল নামজ আদায় করার দ্বারা তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখুলুল মসজিদ উভয়টি এক সাথে আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন কিতাবে উল্লেখ্য আছ যে, মাসজিদে প্রবেশ করে যেকোন নামাজ আদায় করলেই 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় হয়ে যাবে। অনুরুপভাবে ওযু করার পর ওযুর পানি শুষ্ক হওয়ার পূর্বে কোন নামাজ আদায় করলেই 'তাহিয়্যাতুল ওযু' আদায় হয়ে যাবে।(আহসানুল ফাতওয়া ৩:৪৮১ পৃ ; রাদ্দুল মুহতার ১:৫০২ পৃ.)

'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' -এর ফযীলতঃ

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরুপে ওযু করে, অতঃপর দুই রাকাআত নামাজ এমনভাবে আদায় করে যে, নামাজের মধ্যে কোন ভূল করে না। অর্থাৎ খুশু -খুজুর সাথে নামাজ আদায় করে, তাহলে তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (সহীহ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯০৫)

হযরত ওসমান বলেছেন (.সা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে নবী করীম (.রাজি), যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে এক নামাজ থেকে অন্য নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ তামুসলি) আলা তার সগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন।'ম শরীফ, ১ম খ-, ১২০ পৃষ্ঠা(

(৫) জানাজার নামায:

কোনো মুসলিম ইন্তেকাল করলে তার মাগফিরাতের জন্য মরদেহ সামনে নিয়ে বিশেষ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তার নাম জানাজার নামায। জানাজার নামায এর গুরুত্ব ইসলামে অনেক বেশি। মৃতের জানাজা, কাফনদাফন- ইত্যাদি জীবিত মুসলমানদের ওপর মৃতদের অধিকার এবং অবশ্য পালনীয় ফরজ নির্দেশ। কোনো মুসলমান মারা গেলে তার জানাজার নামায আদায় করা ফরজে কিফায়া। কিছুসংখ্যক মুসলমান এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হবে; যদিও এলাকার সব লোক ও আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব হচ্ছে মৃতের জানাজা (সুন্নাত) ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা এবং তার স্বজনদের সান্ত্বনা দেওয়া।

জানাজার নামায মৃতের অধিকার

আবু হুরায়রা বলেন (.সা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (.রা), 'এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে—

এক. যখন কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হয় তখন সালাম দেবে। দুই. কোনো মুসলমান ডাকলে সাড়া দেবে। তিন. সে তোমার কাছে সত্ পরামর্শ চাইলে তুমি তাকে সত্ পরামর্শ দেবে। চার. কোনো মুসলমানের হাঁচি এলে হাঁচিদাতা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বললে জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলবে। পাঁচ. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। ছয়. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় শরিক হবে।” (মুসলিম, হাদিস : ২১৬২)

অন্যত্র, উসমান যখন কোনো মৃত ব্যক্তির দাফনকাজ শেষ (.সা) মহানবী -বর্ণিত রয়েছে (.রা) করতেনতখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সাহাবাদের বলতেন —, ‘তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমার দোয়া করো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন -তাকে ঈমানের ওপর দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ’(আবু দাউদ, হাদিস : ৩২২১(

জানাজার নামাযের ফজিলত:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানাযা আদায় করে ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। ‘উসমান আল-মুয়ায্যিন (রহঃ)....আবূ হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (১৩২৩, ১৩২৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৫, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৫) (সহিহ বুখারী :৪৭)

(৬) তারাবীহর নামায:

তারাবীর নামাযের হুকুম ও ফযীলত:

রমযান মাসে ইশার পর বিতরের আগে যে নামায পড়া হয় তা হল তারাবীর নামায। এই নামায নারী পুরুষ সকলের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তারাবীর নামায পড়েছেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের পর সাহাবা-তাবেয়ীনও গুরুত্বের সাথে তারাবীর নামায আদায় করেছেন।

তারাবীর নামায রমযানুল মুবারকের অন্যতম শিআর বা প্রতীক। মুসলিমদের হৃদয়ে রয়েছে তারাবীর অনেক মর্যাদা ও মহত্ত্ব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটও আছে এর বিশেষ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের রাতে ইবাদত করবে তার অতীতের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭

হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রেখে এবং আল্লাহ্র দরবারে আজর ও সাওয়াবের আশা পোষণ করে রমযানের রাতে নামায, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকবে, আল্লাহ তার পিছনের যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন। বাকি কবীরা! তো সেজন্য খালেস নিয়তে তাওবা করতে হবে। অনেক আলেম এ বিষয়ে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। (আলফিকহুল ওয়াযিহ আলাল মাযাহিবিল আরবা, ড মুহাম্মাদ বকর . ইসমাঈল৩/২৫)

তারাবীহর নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

ইবনে কুদামা রাহ. তাঁর বৃহৎ ও বিস্তৃত গ্রন্থ 'আলমুগনী'তে বলেন-

তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদা। সর্বপ্রথম যিনি এই নামায চালু করেছেন তিনি হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিষয়টি একাধিক হাদীসে বিবৃত হয়েছে। যেমন :

১. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কিয়াম তথা রাতের বেলা ইবাদত-বন্দেগীর উৎসাহ দিতেন। কিন্তু দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানের রাতে ইবাদত করবে তার অতীতের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৯

২. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন-

إنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النّاسُ، ثُمّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللّيْلَةِ الثّالِثَةِ، أَوِ الرّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَلَمّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلّا أَنّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

রমযানের এক রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁর পিছনে ইক্তিদা করেছেন। দ্বিতীয় রাতেও তিনি নামায পড়েছেন। এ রাতে প্রচুর মুসল্লী হয়েছে। এরপর তৃতীয় বা (রাবী বলেছেন) চতুর্থ রাতে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জড়ো হয়েছেন; কিন্তু ঐ রাতে তিনি কামরা থেকে বের হননি।

সকাল হলে তিনি সাহাবাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা যে এসেছো তা আমি দেখেছি। তবে, আমি তোমাদের কাছে আসিনি এ আশঙ্কায় যে, না জানি এই নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬১

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত-

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَصَابُوا، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا.

একদা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামরা থেকে বের হয়ে মসজিদে আসলেন। দেখেন, কিছু লোক মসজিদের এককোণে নামায পড়ছে। জিজ্ঞেস করলেন, এরা

কী করছে? বলা হল, তারা নিজেরা কুরআনের হাফেয নয়, তাই উবাই ইবনে কা'বের পিছনে নামায পড়ছে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ঠিক করেছে। কাজটা খুব ভালো হয়েছে।২

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর নামায প্রথম পড়েছেন। এরপরও বলা হয়, উমর রা. তারাবীর নামায চালু করেছেন। এর কারণ হল, তিনিই সর্বপ্রথম উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পিছনে জামাতের ব্যবস্থা করেছেন। তার নির্দেশে উবাই ইবনে কা'ব রা. লোকদের নিয়ে তারাবীর জামাত শুরু করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী রাহ. বলেন-

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النّاسُ أَوْزَاعٌ _أَيْ يُصَلُّوْنَ جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ_ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ _أَيْ أَفْضَلَ وَأَقْرَبَ إِلَى الْخَيْرِ_ ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللّيْلِ وَكَانَ النّاسُ يَقُومُونَ أَوّلَهُ.

রমযানের এক রাতে উমর রা.-এর সাথে বের হলাম। দেখি, লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জামাত করে নামায পড়ছে। কেউ একা একা পড়ছে আর কেউ ইমামতি করছে, কিছু লোক তার ইক্তিদা করছে। উমর রা. বললেন, মনে হচ্ছে, সবাইকে যদি এক ইমামের পিছনে জমা করিয়ে দিই তাহলে ভালো হবে। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন।

আরেক রাতে তাঁর সাথে বের হলাম। লোকজন উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পিছনে জামাতের সাথে নামায পড়ছেন। উমর রা. তখন বললেন, এটা উত্তম বিদআত।

সাহাবায়ে কেরাম রাতের প্রথমাংশে (তারাবীর) নামায পড়তেন। উমর রা. বললেন, এই নামায থেকে ঐ নামায উত্তম, যার সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে। অর্থাৎ শেষ রাতের নামায। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১০) -আলমুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৬৬

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, সর্বপ্রথম যিনি তারাবীর নামায পড়েছেন তিনি হলেন সায়্যিদুনা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাহাবীদের নিয়ে তিন বা চার রাত্রে তারাবীর জামাত করেছেন। এরপর তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আর জামাত করেননি। কেননা, তিনি আশঙ্কা করেছেন, তিনি নিয়মিত জামাতের সাথে তারাবীর নামায পড়লে তারাবীর নামায ফরয হয়ে যেতে পারে। ফলে নিয়মিত আদায় করতে না পারলে কবীরা গুনাহ হবে। বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি-

إِنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَصَلّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النّاسُ يَتَحَدّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّيْلَةِ الثّانِيَةِ، فَصَلّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللّيْلَةِ الثّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمّا كَانَتِ اللّيْلَةُ الرّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ، ثُمّ تَشَهّدَ، فَقَالَ: أَمّا بَعْدُ، فَإِنّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيّ شَأْنُكُمُ اللّيْلَةَ، وَلَكِنّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.

রমযান মাসে একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন। কিছু লোক তাঁর পিছনে ইক্তিদা করল। ভোর হলে লোকজন বিষয়টা নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করল। পরের রাতে আরো বেশি মানুষ জমা হল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়েছেন, তারা তাঁর পেছনে নামায পড়েছে। সকাল হলে লোকেরা তা নিয়ে আরো বেশি আলোচনা করল। তাই তৃতীয় রাতে মুসল্লীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। নবীজী মসজিদে গিয়ে নামায পড়েছেন, লোকেরা তাঁর ইক্তিদা করেছে। চতুর্থ রাতে এত বেশি মুসল্লী হয়েছে যে, মসজিদে সংকুলান হচ্ছে না। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাতে নামাযের জন্য বের হলেন না। তা দেখে কিছু লোক আস্সালাত, আস্সালাত বলে আওয়ায দিতে লাগল। কিন্তু না, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন না। একেবারে ফজরের সময় মসজিদে গিয়েছেন। ফজরের নামায শেষ হলে তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরলেন এবং খুতবা পড়ে বললেন, শোন! আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছি, (নিয়মিত জামাত

করলে) না জানি, তারাবীর নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় আর তখন তা আদায় করতে তোমরা অক্ষম হয়ে যাও। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৯২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬১

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে-

فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

এ অবস্থায়ই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল হয়ে যায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১২

(৭) সালাতুত দুহা (ইশরাক ও চাশত):

নবীজি (.সা)উম্মতকে ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এই দুই নামাযকে সালাতুদ দুহাও বলা হয়। ইশরাকের পরপরই চাশত সময় শুরু হয়। এসব নামাজের ওয়াক্ত হলো সূর্য উদিত হওয়ার ১৫ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের ৫ মিনিট আগ পর্যন্ত। হাদিসে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ ـ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হল) ১. প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা। ২. সালাতুয-যোহা (আদায় করা)। ৩. বিত্‌র (সালাত) আদায় করে শয়ন করা। (সহিহ বুখারী: ১১৭৮)

ইশরাকের নামায:

সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়। ইশরাকের উত্তম সময় হলো, বেলা ওঠার এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে। হাদিসে এসেছে,

عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। (তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ তারগীব ৪৬৪নং)

চাশতের নামায:

চাশত বা দুহার নামাজ আদায় করতে হয় সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার আগ মুহূর্তে। 'দুহা' শব্দের অর্থ 'প্রভাত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য', যা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। সুতরাং দুহা বা চাশতের নামাজ সূর্যের তাপ যখন প্রখর হতে শুরু করে তখন এই নামাজ আদায় করা উত্তম।

চাশতের নামাজের নিয়ম:

চাশতের নামাজের নিয়ম সাধারণ নফল নামাজের মতো। সূর্য এক-চতুর্থাংশ উপরে উঠলে, গ্রীষ্মকালে ৯টা-১০টা, আর শীতকালে ১০টা-১১টার সময় সাধারণত তা আদায় করা হয়। কোনো সুন্নত নামাজে যেমন দুই রাকাত পড়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে থাকেন, এখানেও তেমনই। ইশরাক নামাজের নিয়ম চাশতের নামাজের মতোই।

চাশতের নামাজ কত রাকাত:

চাশতের নামাজ দুই বা চার রাকাত। চার রাকাত পড়াই উত্তম। আরো বেশিও পড়া যায়। কেননা এটি নফল নামাজ। নফল নামাজ বেশি পড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং সওয়াব রয়েছে। মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের আগে রাসূল (সা.) আলী (রা.) এর বোন উম্মে হানি (রা.)

এর ঘরে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ৮ রাকাত পড়েছিলেন বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে পড়লেও রুকু এবং সেজদায় তিনি পূর্ণ ধীরস্থিরতা বজায় রেখেছিলেন এবং প্রতি দুই রাকাত অন্তর সালাম ফিরিয়েছিলেন। (বুখারি: ২০৭)

হাদিসে এসব নফল নামাজ দুই রাকাত করে পড়ার কথা রয়েছে। হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 'দিন ও রাতের নফল নামাজ দুই দুই রাকাত করে'। (তিরমিজি: ৫৯৭; আবু দাউদ: ১২৯৫)

চাশতের নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

عن أبي ذر أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"

আবূ যার্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশতের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।'' (মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫/১২৮৬)

উল্লেখ্য, চাশত বা দুহা পৃথকভাবে আদায় করার অবকাশ থাকলেও অনেকেই চাশত বা দুহার নামাযকেই ইশরাকের নামায হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, সময়ের শুরুতে আদায় করলে সেটা ইশরাক আর সময়ের শেষে আদায় করলে দুহা।

(৮) ইস্তেখারার নামায:

মানুষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে ও কোন সিদ্ধান্ত তার জন্য কল্যাণকর হবে এবং কীভাবে বিষয় নির্বাচন করবে —এ ব্যাপারে ইসলামের সুন্দর দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যেন মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভে ধন্য হয় এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেখারার শিক্ষা দিয়েছেন। জাবের বিন আবদুল্লাহর আল সুলামি-রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের সব বিষয়ে ইস্তেখারা করার শিক্ষা দিতেন; যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলতেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজের উদ্যোগ নেয়, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায পড়ে। অতঃপর বলে (আরবি দোয়া):

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই ক্ষমতাবান; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে অথবা মনে মনে স্মরণ করবে) আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য (কিংবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে) কল্যাণকর হলে, আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। সেটা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে বরকত দিন।

হে আল্লাহ! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে (কিংবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য) অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে দিন এবং সেটাকেও আমার থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আমার

জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন।' (বুখারি, হাদিস : ৬৩৮২-৬৮৪১; তিরমিজি, হাদিস : ৬৪৮)

সালাতুল ইস্তেখারা কী ও কেন?

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, ইস্তেখারা করা মানে কোনো বিষয় বাছাই ও নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিকে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় বাছাই করে নিতে হবে, সে যেন উত্তমটি বাছাই করে নিতে পারে, সে প্রার্থনা করা।

ইস্তেখারার দোয়ার আগে নামায পড়ার কারণ

ইবনে আবু জামরা (রহ.) আরও বলেন, ইস্তেখারার দোয়ার আগে নামায পড়ার রহস্য হলো, ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একসঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা। আর এটি পেতে হলে মহান আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়া প্রয়োজন। আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তার স্তুতি জ্ঞাপন ও তার কাছে ধরনা দেওয়ার ক্ষেত্রে নামাযের চেয়ে কার্যকর ও সফল আর কিছু নেই। মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহকে বলা আপনি আমার জন্য সেটা সহজ করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :"আর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ফেল তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। "[সূরা আলে ইমরান: ১৫৯]

(৯) ইস্তিসকার নামায:

ইস্তিসকা' মানে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে একাকী কিংবা সমবেতভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার-দুআ-মুনাজাত-রোনাজারি করা; তদ্রুপ একাকী কিংবা সমবেতভাবে সালাত আদায় করা, অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ-মুনাজাত-রোনাজারি করে বৃষ্টি প্রার্থনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-তাবেয়ীন অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ইস্তিগফার ও আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে দুআর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কখনো সমবেত লোকদের নিয়ে সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত) আদায় করে বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন। আবার কখনো সালাত ছাড়া সমবেত লোকদের নিয়ে ইস্তিগফার-দুআ-মুনাজাত-রোনাজারি করে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। সাহাবা-তাবেয়ীনও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন। সামনে এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস ও আছার উল্লেখ করা হচ্ছে-

এক. আনাস ইবনে মলেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ প্রচণ্ড দুর্ভোগে পড়ে। সে সময় এক জুমার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন লোক উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তার কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করার জন্য দুহাত তুললেন এবং বললেন-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন! হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন! হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন!'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সবাই হাত তুলল এবং দুআ করল।

(আনাস রা. বলেন,) সে সময় আমরা আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখিনি। (কিন্তু) যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ শেষ করে) হাত নামানোর আগেই পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খণ্ড উড়ে এল। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নামার আগেই বৃষ্টি শুরু হল এবং আমি দেখলাম যে, তাঁর পবিত্র দাঁড়ি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দুই দিন বৃষ্টি হল। এভাবে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত প্রতিদিন বৃষ্টি হল।

(পরবর্তী জুমার দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অতি বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ি-ঘর ধসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে।

আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত তুলে দুআ করলেন-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দিন), আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়ে ও টিলায়, গিরিখাদে ও বৃক্ষের গোড়ায় বৃষ্টি দিন।

(দুআর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল এবং 'কানাত' উপত্যকায় এক মাস ধরে বৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। (যেহেতু মদীনা ছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টি হচ্ছিল তাই) তখন (মদীনার) চারপাশের যে কোনো অঞ্চল থেকে কেউ এসেছে, সে এ মুষলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০৩৩, ১০১৩, ১০১৪, ১০২৯

اللفظ مأخوذ من جميع الروايات.

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আলাদাভাবে সালাতুল ইস্তিসকা আদায় করেননি; বরং জুমার খুতবার মাঝখানেই দুআ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তোলার পর সমবেত সবাই তাঁর সঙ্গে হাত তুলে দুআ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ইস্তিসকা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য সালাতুল ইস্তিসকা আদায় করা শর্ত নয়। হাঁ, বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সালাতুল ইস্তিসকা আদায় করার কথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। সামনে সালাতুল ইস্তিসকা সম্পর্কিত হাদীসগুলোও উল্লেখ করা হল।

দুই. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে (উন্মুক্ত প্রান্তরে) বের হন। অতঃপর সবাইকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়েন। যাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়েন। তিনি তাঁর চাদর উল্টে দেন এবং দুহাত তুলে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দুআ করেন।

এবং তিনি কিবলামুখী হন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৬১-১১৬২; সহীহ বুখারী, হাদীস ১০১২, ১০২৩, ১০২৮

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় (১০২৩) এই হাদীসের শেষে একথাও আছে যে, দুআর পর বৃষ্টি হয় এবং তারা বৃষ্টিসিক্ত হন- (فأُسقوا)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে প্রান্তরে গিয়ে সালাতুল ইস্তিসকা আদায় করেছেন, নামাযে তিনি সশব্দে কেরাত পড়েছেন, কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করেছেন এবং নিজের গায়ের চাদর উল্টে দিয়েছেন।

মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে এই হাদীসের শেষে একথা আছে যে-

قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

তিনি খুতবার আগে নামায আদায় করেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৪৬৬; ফাতহুল বারী ২/৫৮০ (১০১২ নং হাদীসের আলোচনা)

সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই হাদীসটির শেষে কীভাবে চাদর উল্টে দিয়েছেন তার বয়ান আছে। সেখানে আছে যে, চাদরের ডান প্রান্ত বাম কাঁধে আর বাম প্রান্ত ডান কাঁধে রেখেছেন। (দ্রষ্টব্য : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৬৩)

وحوَّل رداءَه، فجعل عِطَافَه الأيمنَ على عاتقِهِ الأيسرِ، وجعل عطافَه الأَيْسَرَ على عاتِقِه الأيمنِ.

আর চাদর কখন উল্টে দেবে তার কথা আছে সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায়-

وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

তিনি তাঁর চাদর উল্টে দেন যখন তিনি কিবলামুখী হন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৯৪

ইতিকথা:

নামায এমন এক আমল যা বান্দার প্রতি রবের আদেশই কেবল নয়, বরং তা বান্দার প্রতি রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহও বটে। কেননা নামাযে মূমিন খুঁজে পায় কলবের সুকুন। নামায বান্দা আর তাঁর আল্লাহর সরাসরি কথোপকথন, যেখানে বান্দা তার সব কষ্ট-যাতনা, দু'আ রবকে জানাতে পারে নির্ভয়ে। নামাযই সর্বদা মূমিনের মনে জাগরূক রাখে রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহের কথা এবং একইসাথে আখিরাত দিবসে জবাবদিহির কথা। মূমিন ব্যক্তি তাই হতাশ হন না, সিরাত্বল মুস্তাক্বীম থেকে ছিটকে পড়েন না। নামাযই তাকে বিরত রাখে পাপ-পঙ্কিলতার কালিমা আর ফিতনা-ফাসাদ থেকে। নামায মূমিনের দুনিয়ার সফরে আসে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত – দুই জাহানের সফলতার জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে নামাযে নিয়মিত হওয়ার ও খুশু-খুযুর সহিত আদায় করার তাওফিক্ব দিন। আমীন ইয়া রব্বুল আলামীন।